সম্পূর্ণ উপন্যাস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

র্তিক মাসের এই সকালবেলাটায় ঝলমলে রোদ আর মিঠে হাওয়ায় পায়েসপুরের চারদিকেই একটা প্রসন্ন ভাব। সদানন্দ গান গেয়ে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। তার গলায় সুর নেই বটে, কিন্তু চেষ্টা আছে। কেপুবাবু তাঁর খোলা বারান্দায় মোড়া পেতে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছেন, যদিও কাগজখানা সাত দিনের পুরনো। আসলে তিনি পড়ছেন না, ওইভাবে রোজই

ছবি: দেবাশিস দেব
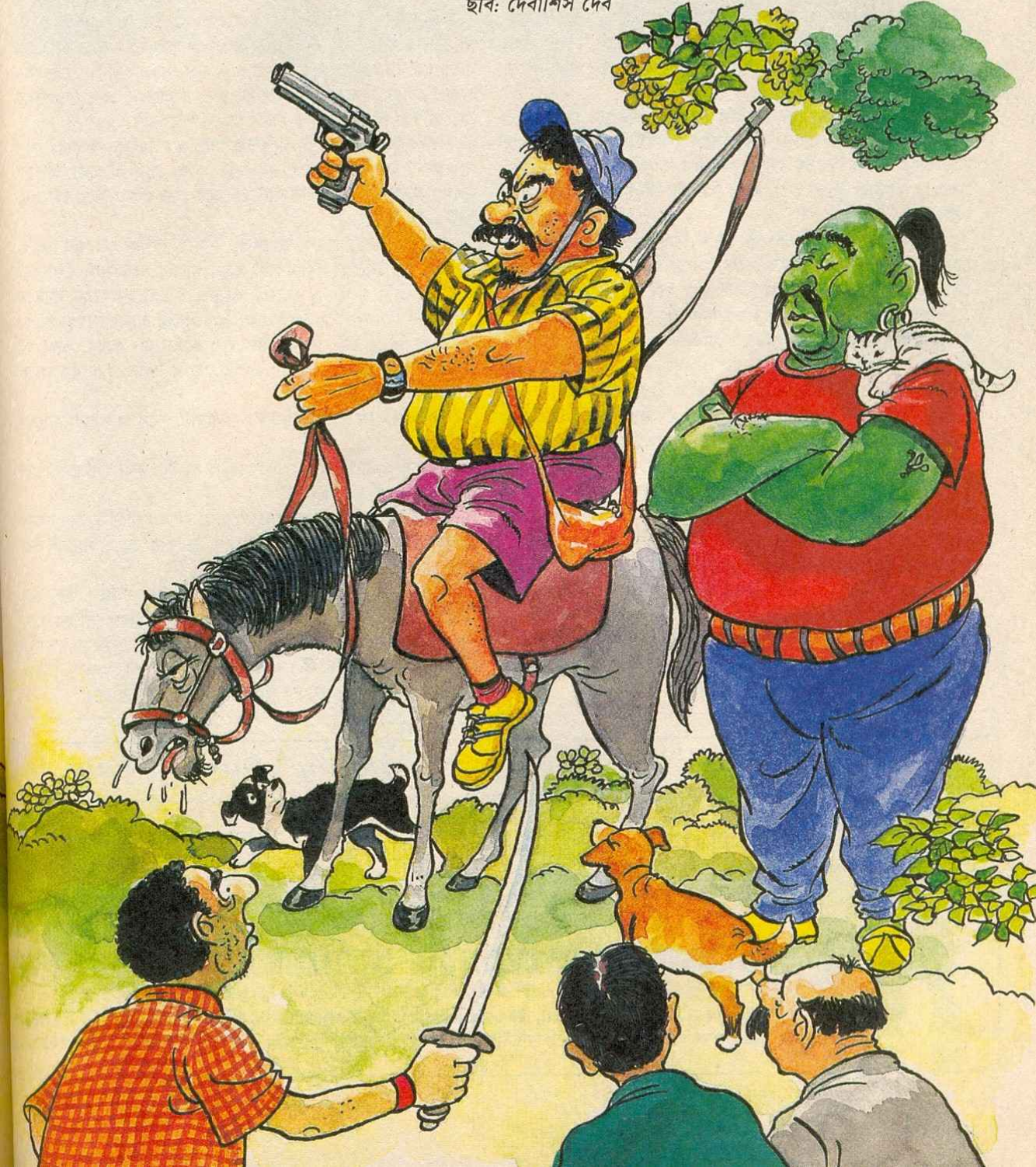
তিনি চারদিকে নজর রাখেন। রাধাগোবিন্দবাবু তাঁর বাইরের ঘরে জানালার কাছে টেবিলের ধারে চেয়ার পেতে বসে আত্মমগ্ন হয়ে তাঁর আত্মজীবনী লিখছেন। প্রথমে বইয়ের নাম দিয়েছিলেন 'এক বীরের আত্মকথা'। তারপর সতেরোবার নাম বদল করে ইদানীং নাম দিয়েছেন 'দারোগার দীর্ঘশ্বাস'। এই নামও হয়তো বদলে যাবে। তবে এই বইয়ে নানা দুর্ধর্ষ অভিযান এবং রোমহর্ষক লড়াইয়ের কথা আছে বলে শোনা যায়। বই বেরোলে বনমালীর মোচার চপের মতোই দেখ-না-দেখ বিকিয়ে যাবে বলে তাঁর ধারণা। আজ সকালে হারানবাবু তাঁর চশমা খুঁজে পাচ্ছেন না। গতকাল তাঁর নস্যির ডিবে হারিয়েছিল। পরশু হারিয়েছিল তাঁর হাওয়াই চটির একটা পাটি। তার আগের দিন গায়েব হয়েছিল তাঁর হাতঘড়ি। হারানবাবুর নাম মোটেই হারান নয়। তাঁর নাম হারাধন খাঁড়া। কিন্তু প্রায়ই জিনিস হারিয়ে ফেলেন বলে লোকে তাঁর নাম রেখেছে হারান।

কদমতলায় বসে মদনপাগলা একটা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে মাটিতে আঁক কাটতে-কাটতে বলছে, "দুইয়ে-দুইয়ে চার হয় সে না হয় বুঝলুম, তিনে দুইয়ে পাঁচ হয় এটাও না হয় মেনে লওয়া গেল, কিন্তু চারটে জিলিপির সঙ্গে দু'টো শিঙাড়া যোগ করলে কেমন হয় সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।"

তারক তর্কালঙ্কার বাজার করে ফিরছিল, উলটো দিক থেকে আসছিল সবজান্তা জয়লাল। জয়লালকে দেখেই তারক মুখ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি নবীনমাস্টারের বাড়ির ফটকের কাছে গিয়ে হাঁক মারল, "কই হে মাস্টার, এসো তো, আজ রিলেটিভিটি নিয়ে একহাত হয়ে যাক।"

ওদিকে জয়লালও তারককে দেখে বিপরীত দিকে হাঁটা দিয়ে গোপালময়রার দোকানে ঢুকে পড়ে বলতে লাগল, "দেদো সন্দেশ তৈরির কায়দাটা একদিন তোমাকে শিখিয়ে যাব হে গোপাল।"

আসলে তারক আর জয়লালের ইদানীং ঝগড়ার জের চলছে। কেউ কারও মুখদর্শন করে না। ব্যাপারটা হয়েছিল কী, একদিন মদনপাগলার খুব বাই উঠেছিল, মেঘের খিচুড়ি খাবে। একটা মেটে হাঁড়ি নিয়ে মেঘ ধরার জন্য ইটভাঁটার মাঠে ঘাপটি মেরে বসে ছিল। তাই দেখে জয়লাল অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল, "হুঁঃ, মেঘের খিচুড়ি! এর পর শুনব আকাশের পায়েস, জলের বেগুনি, বাতাসের চচ্চড়ি এসবও হবে। পাগল আর কাকে বলে!"

জয়লালের মন্তব্যটা তারকের তেমন পছন্দ হল না। সে বরাবর মনে-মনে ধারণা করে এসেছে যে, মদনপাগলা সাধারণ পাগল নয়, জ্ঞানী পাগল। তাই সে বলল, "মেঘের খিচুড়ি হবে না কেন হে! মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, আর বৃষ্টির জল ধরে তাই দিয়ে খিচুড়ি রাঁধলেই হল। মদনের কথার ভিতর একটা ডেপ্‌থ থাকে, বুঝেছ! তলিয়ে বুঝতে হয়।"

এ কথায় চটে গিয়ে জয়লাল বলল, "তা বৃষ্টির জল তো পুকুরটুকুরেও পড়ছে, সেই জল দিয়ে খিচুড়ি রাঁধলে সেটাও কি তোমার ওই মেঘের খিচুড়ি নয়?"

তারক দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "না, তা নয়! ডাইরেক্ট বৃষ্টির জলের মধ্যে যে ইলেকট্রিসিটি থাকে, তা পুকুরে পড়লে নষ্ট হয়ে যায়। দ্যাখোনি, গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি না হলে লঙ্কার ঝাল কমে যায়। যতই জল ছিটোও না কেন, কিছুতেই ঝাল আসে না। কিন্তু যেই দু' ফোঁটা বৃষ্টির জল লঙ্কাগাছে পড়ল, অমনি চিড়বিড়িয়ে উঠল তার ঝাল।"

এই নিয়েই দু'জনের ঝগড়া তুঙ্গে উঠে গেল। গত পনেরো দিন তাদের বাক্যালাপ, মুখদর্শন বন্ধ।

'ইন্ধনহীন রন্ধন' নামে এক আশ্চর্য উনুন আবিষ্কার করে প্রযুক্তিবিদ হলধর ঘোষ সারা গাঁয়ে হুলস্থুল ফেলে দিয়েছিলেন। কয়লা, কাঠ, গ্যাস বা বিদ্যুৎ, এমনকী, সৌরশক্তি ছাড়াই তাতে রান্না হওয়ার কথা। দুঃখের বিষয়, শেষ অবধি সেই চুল্লিতে অনেক চেষ্টায় একবাটি জল একটুখানি গরম হয়েছিল মাত্র। হলধরের আবিষ্কৃত 'অটো মিস্তিরি' নামক আশ্চর্য যন্ত্রের রেডিও, টিভি বা যে-কোনও বস্তু মেরামত করার কথা। কার্যত কী একটা গোলযোগে সেটা আজও চালু করা যায়নি। তাঁর অটো ইস্তিরি যন্ত্র তো আরও সরেস। ধুতি, পাঞ্জাবি, শার্ট, প্যান্ট, শাড়ি অতি যত্নে ঠিকঠাক ভাঁজ ও ইস্তিরি করে দিতে পারে। কী একটা সামান্য উপকরণের অভাবে সেটাও এখনও সচল হয়নি। তবে এসব ছাড়াও হলধর বিস্তর জিনিস আবিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু সেগুলোর উপযোগিতা কী তা এখনও ভেবে উঠতে পারেননি।

গত কয়েকদিন একটি আবিষ্কার নিয়ে মগ্ন ছিলেন হলধর। কাল সারারাত জেগে আজ ভোরেই তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। আনন্দে ডগমগ করতে-করতে তিনি বাইরের ঘরে ঢুকে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "ইউরেকা! ইউরেকা!"

বাইরের ঘরে খগেন তপাদার, নিমাই বিশ্বাস, ব্রজেন বোস, গজপতি রায়, নগেন সর্বাধিকারী প্রমুখ গাঁয়ের মাথা-মাথা লোকেরা বসে গুলতানি করছেন। রোজই করেন। কারণ, হলধরের বাড়িতে রোজই সকালে ফুরফুরে চিড়েভাজা আর সুগন্ধী চায়ের ব্যবস্থা থাকে। 'ইউরেকা' শুনে কেউ বিশেষ উদ্বেলিত হলেন না। কারণ, তাঁরা এই ঘোষণা প্রায়ই শুনে থাকেন। গজপতি রায় বললেন, "তা কী জিনিস আবিষ্কার করলে হে?"

হলধর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "সে আপনারা বুঝবেন না।"

"আহা, আমাদের বুঝবার দরকারটাই বা কী? কথা হল, তুমি নিজে বুঝে উঠতে পেরেছ কিনা।"

হলধর গম্ভীর গলায় বললেন, "বোঝা যাবে মশাই, দু'-চার দিনের মধ্যেই বোঝা যাবে। তারপর দেখবেন, দুনিয়ার তাবড় সায়েন্টিস্টরা লাট খেয়ে এসে এই পায়ের উপর পড়বে।"

খগেন তপাদার শঙ্কিত গলায় বলে উঠলেন, "উঁহু, উঁহু, ওটা মোটেই ঠিক হবে না। অত হোঁতকা, পেল্লায় চেহারার সাহেব এসে তোমার প্যাকাটির মতো পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কুমড়ো গড়াগড়ি খেলে তোমার সুবিধে কী? দু'খানা তো মোটে পা, অত সাহেবের মধ্যে ভাগাভাগি হলে যে ভাগের পা গঙ্গাযাত্রা করবে হে!"

হলধর রোষকষায়িত লোচনে খগেনের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তাকে ভস্ম করার একটা চেষ্টা করে বললেন, "জানো, আমি একসময় ফার্স্ট ডিভিশনের ফুটবল খেলোয়াড় ছিলাম! কোন সাহসে তুমি বললে যে, আমার পা প্যাঁকাটির মতো?"

ব্রজেন বোস তাড়াতাড়ি মাঝখানে পড়ে বললেন, "আহা, যেতে দাও ভায়া, যেতে দাও! একথা কে না জানে যে, খগেনের চোখে ছানি পড়েছে! আর এও সবাই জানে যে, তুমি একসময় দুর্দান্ত ফুটবল খেলতে। বিজ্ঞানের পায়ে সেই ফুটবলকে উৎসর্গ করেছ বই তো নয়! একসময় ফুটবল নিয়ে তুমি যেমন ছিনিমিনি খেলতে আর অপোনেন্টকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতে, আজও তেমনই বিজ্ঞানকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ আর পাঁচজনকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে চলেছ।"

কথাটা শুনে হলধর প্রথমটায় খুশি হয়ে মাথা নাড়ছিলেন, কিন্তু অন্য সকলের খুকখুক হাসির শব্দ পেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, "ব্রজেন, কাল থেকে তোমার চা আর খগেনের চিঁড়েভাজা বন্ধ।"

ব্রজেন দুঃখিত হয়ে বললেন, "কলিকালের সবচেয়ে বড় লক্ষণ কী জানো? লোকে ভাল কথাকেও উলটো করে বোঝে।"

দাড়ি-গোঁফ এবং চিন্তায় সমাচ্ছন্ন হয়ে নগেন সর্বাধিকারী এতক্ষণ এক পাশে চুপ করে বসে ছিলেন। বলতে কী, তিনিই পায়েসপুরের সবচেয়ে বলিয়ে-কইয়ে আর হাসিখুশি লোক। কিন্তু কয়েকদিন হল তাঁর মনটা বিশেষ ভাল নেই। কথা বন্ধ, কপালে চিন্তার ভাঁজ, চোখে অন্যমনস্কতা, মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাসও পড়ছে। "কী হয়েছে," জিজ্ঞেস করলে একটু অবাক হয়ে বলছেন, "কই, কিছু হয়নি তো!" চাপাচাপি করেও লাভ হচ্ছে না।

গাঁয়ের কেউ বলছে, নগেনের ছোট নাতি পান্টু গত পরীক্ষায় ইংরেজিতে ফেল করেছে বলে তাঁর মনখারাপ। পাড়ার ক্লাবের সেক্রেটারি সুবলের ধারণা, শিল্ডের খেলায় মোহনবাগান হেরে যাওয়ায় নগেন ভেঙে পড়েছেন। হারু নস্করের আরও গোপন খবর হল, বাসুচোর নাকি সেদিন রাতে নগেনবাবুর বাড়িতে হানা দিয়ে তন্নতন্ন করে হাতড়েও বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সার বেশি না পেয়ে রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই ভাষায় কিপ্‌টে নগেনবাবুকে খুব অপমান করে যাওয়ায় তিনি গুম মেরে গিয়েছেন। লটারির এজেন্ট বিশ্বপতি দুঃখ করে বলেছে, "না না, ওসব নয়। তিন দুই পাঁচ সাত দুই এক নম্বর টিকিটে পাঁচ লাখ টাকা প্রাইজ পেয়ে কেতনপুর গাঁয়ের নবকুমার ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে চেপে সপরিবার কাশ্মীর বেড়াতে চলে গেল। আর নগেনবাবুর টিকিটের নম্বর হল তিন দুই পাঁচ সাত দুই শূন্য। তাই নগেনবাবু ভারী মনমরা হয়ে পড়েছেন।"

তাঁর পাশের বাড়ির দ্বিজেন সামন্ত অবশ্য অন্য কথা বলে বেড়াচ্ছে, "কয়েকদিন আগে নাকি এক জটাজুটধারী পেল্লায় চেহারার সাধু এসে নগেনকে বলল, 'তোর ভাগ্য খুলে গেল রে ব্যাটা। ছপ্পর ফুঁড়ে তোর পয়সা আসছে। তার আগে এই সাধুকে একটু ভোজন করা তো ব্যাটা!' এই শুনে নগেনবাবু রেগে গিয়ে সাধুকে বাংলা, ইংরিজি এবং হিন্দিতেও খুব গালাগালি করেন, 'কেটে পড়ো, গেট আউট এবং ভাগো হিঁয়াসে,' বলে তাড়িয়ে দেন। সাধু তখন ঝোলা থেকে একটা পাথর বের করে বলল, 'তুই কী জিনিস হারালি তা জানিস না! সারাজীবন বুক চাপড়ে, হা-হুতাশ করে মরবি। এই দ্যাখ,' বলে সাধু পাথরটা ত্রিশূলে ঠেকাতেই নাকি ত্রিশূল সোনা হয়ে যায়। তাই দেখে নগেন মূর্ছা যান। মূর্ছা ভাঙার পর থেকেই তিনি নাকি ভেঙে পড়েছেন। বিস্তর খুঁজেও সাধুর টিকিটিও আর দেখা যায়নি।"

রটনাগুলো যে সব মিথ্যে এমন কথাও বলা যাবে না। নগেনবাবুর ছোট নাতি পান্টু গত পরীক্ষায় বাস্তবিকই ইংরেজিতে এগারো পেয়েছে। এও সত্যি যে, শিল্ডের খেলায় মোহনবাগান হেরেছে। আর ক'দিন আগে যে একটা চোর নগেনবাবুর বাড়িতে হানা দিয়েছিল এবং পরদিন ভূপেনদারোগা কী কী চুরি গিয়েছে তার তালিকা চাওয়ায় নগেনবাবু খুবই অপ্রতিভ মুখে আমতা-আমতা করেছিলেন, এও সবাই জানে। নবকুমার যে লটারিতে পাঁচ লাখ জিতেছে এবং নগেনবাবুর ভাগ্যে যে অল্পের জন্য শিকে ছেঁড়েনি, এটাও কারও অবিদিত নয়। দিনপাঁচেক আগে এক দুপুরে যে পেল্লায় চেহারার এক সাধু নগেনের বাড়িতে হানা দিয়েছিল এটাও ঘটনা। তবে ঠিক কী কারণে নগেনবাবু গুম মেরে গিয়েছেন সেটা এখনও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

চা আর চিঁড়েভাজা এসে গিয়েছে। কাজেই সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ঠিক এই সময় হঠাৎ মৌনী ভেঙে নগেন সর্বাধিকারী অস্ফুট গলায় কী যেন একটা বলে উঠলেন। চিঁড়েভাজার দরুন কথাটা ভাল বোঝা গেল না। খগেন তপাদার একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, "কী যেন বললেন নগেনদা? কাবলিওয়ালা না কী যেন!"

নিমাই বিশ্বাস মাথা নেড়ে বললেন, "আরে না, না। নগেনদা বলল, সবরিকলা।"

গজপতি একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, "দুর-দুর, নগেনদা স্পষ্ট বলেছেন পালকিওয়ালা।"

ব্রজেন বোস বললেন, "আমি যেন ডাল মে কালা শুনলাম।"

হলধর বিরক্ত হয়ে বললেন, "আহা, আপনাদের সবতাতেই হুড়োহুড়ি। নগেনদা তো আর বোবা নন, নিজেই বলবেন'খন। একটু সবুর করুন।"

নগেনবাবু ভারী বিস্মিত হয়ে সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে বললেন, "কিছু বলেছি নাকি?"

নিমাই বিশ্বাস জোরের সঙ্গে বললেন, "আলবাত বলেছেন। দু' দিনের মৌনী ভেঙে এই তো প্রথম কথা ফুটল আপনার।"

নগেন চিঁড়ে চিবোতে-চিবোতে বললেন, "তা হবে হয়তো। কিন্তু কী বলেছি সেটা আমারও আর মনে নেই।"

খগেন তপাদার চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "কাবলিওলাটাকে আমিও দেখেছি বটে, তবে অনেকটা দূর থেকে। পরশু সকালের দিকে যখন খেতের কাজ তদারক করে ফিরছিলুম, তখন দূর থেকে যেন দেখলুম, ঝোলা কাঁধে দুল্‌কি চালে ব্যাটা বটতলার মোড় থেকে বাঁ দিকে ঘুরে গেল। বেশ ময়লা জামাকাপড়, আর তেমন লম্বা-চওড়াও নয়।"

হঠাৎ অস্ফুটস্বরে নগেন সর্বাধিকারী ফের কী একটা বলে উঠলেন।

নিমাই ঝুঁকে পড়ে বললেন, "কে এসে গিয়েছে? কার কথা বলছেন, ও নগেনদা?"

নগেনবাবু তাড়াতাড়ি গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ভারী অবাক হয়ে বললেন, "কই বাপু, কিছু তো বলিনি!"

নিমাই দমে গিয়ে বললেন, "স্পষ্ট শুনলুম যে!"

অন্য সবাইও প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, "আমরাও তো শুনেছি!"

নগেন উদাস হয়ে বললেন, "ওরে বাপু, পঁচাশি বছর বয়স হল, এখন দু'-চারটে কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতেই পারে। ও কিছু নয়।"

খগেন তপাদার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "নাঃ, ওই সাধুবাবাই কিছু একটা তুকতাক করে গিয়েছে দেখছি। নইলে নগেনদার মতো একটা হাসিখুশি লোক কী রাতারাতি আঙুর থেকে আমসি হয়ে যেতে পারে?"

হলধর ধমক দিয়ে বললেন, "তোমাদের মতো দুর্বলচিত্ত আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের জন্যই আজও বুজরুকরা করে খাচ্ছে, বুঝলে? তুকতাকে যদি কাজ হত তা হলে আর সায়েন্সের দরকারই হত না।"

গজপতি বললেন, "আহা, চটো কেন ভায়া? তুকতাকটা কথার কথা! আমরা কেউ ওসবে মোটেই বিশ্বাস করি না। সায়েন্সেই আমাদের অচলা ভক্তি। নইলে সকাল থেকে এসে তোমার বাড়িতে ধরনা দিই কেন?"

হলধর ফুঁসে উঠে বললেন, "আপনি আর সাধু সাজবেন না। এই তো মাসখানেক আগে বগলামুখী কবচ আর রক্তপ্রবাল ধারণ করলেন, গেলবার শ্মশানকালীর সোনার নথ গড়িয়ে দিয়েছিলেন, গত

সপ্তাহেও আপনার বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো হয়েছে।"

গজপতি একগাল হেসে বললেন, "তা ভায়া, সত্যনারায়ণ পুজো না হয় খারাপ, কিন্তু তুমি যে সত্যনারায়ণের একবাটি সিন্নি বেশ চেটেপুটে খেলে?"

"সিন্নি খেতে অতি চমৎকার, তাই খেয়েছি। সত্যনারায়ণের প্রসাদ বলে তো আর খাইনি!"

ব্রজেন বোস বলে উঠলেন, "আমারও সেই কথা। নাস্তিক বলে কি সিন্নি খাব না? গজপতির বাড়ির সিন্নিটা হয়ও ভারী চমৎকার।"

হলধর চোখ রাঙিয়ে বললেন, "আপনি আর বলবেন না তো! আপনি আবার কবে থেকে নাস্তিক হলেন? হরিসভায় বসে কীর্তন শোনেন, শনিমন্দিরে গিয়ে রোজ সন্ধেবেলা নমো ঠোকেন, প্রতি বেস্পতিবার আপনার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হয়। নাস্তিক হতে বুকের পাটা চাই মশাই। ভণ্ডামি করে নাস্তিক হওয়া যায় না।"

ব্রজেন ভারী আহ্লাদের গলায় বললেন, "আহা, আমি তো সেই কথাই বলতে চাইছি। এই হরিসভায় বা শনিমন্দিরে যাওয়া বা বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করা, এসব হল ভণ্ডামি, ভিতরে-ভিতরে আমি খুব নাস্তিক।"

ঠিক এই সময় নগেনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "উঃ, পঁচাত্তর বছর পর!"

এ কথাটা সকলেই বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলেন। কথাবার্তা থামিয়ে সবাই অবাক হয়ে নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন। নিমাই বিশ্বাস বলে উঠলেন, "পঁচাত্তর বছর পর কী নগেনদা?"

নগেন সর্বাধিকারী ভারী অপ্রতিভ হয়ে চারদিকে মিটমিট করে চেয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "না না, ও কিছু নয়!"

নিমাই বিশ্বাস চেপে ধরলেন, "কিছু নয় বললে তো শুনব না নগেনদা। 'পঁচাত্তর বছর পর' কথাটার মানে কী?"

নগেন সর্বাধিকারী ভারী জড়সড় হয়ে চারদিকে টালুমালু করে তাকাতে-তাকাতে বললেন, "না, এই বলছিলাম আর কী যে, পঁচাত্তর বছর বেশ লম্বা সময়। তা নয় কি?"

"তা তো বটেই। কিন্তু আপনার তা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে কেন?"

ভারী অবাক হয়ে নগেনবাবু বললেন, "আমার সমস্যা! না না, আমার সমস্যা কিসের?"

গাঁয়ে গোয়েন্দাগিরিতে খগেন তপাদারের একটু খ্যাতি আছে। কোথাও চুরিটুরি হলে বা কারও বাড়িতে কিছু খোয়া গেলে, গোরু, ছাগল হারালে বা সন্দেহজনক কিছু ঘটলে খগেন তপাদারের খোঁজ পড়ে। বলতে নেই, খগেন তপাদার কিছু চুরি-জোচ্চুরির হিল্লে করে দিয়েছেন। অন্তত এক ডজন গোরু এবং গোটা পঁচিশেক ছাগলের হদিশ করে দিয়েছেন। এই তো সেদিন ময়রাগিন্নির হারানো সোনার বালা তাদেরই পুকুর থেকে উদ্ধার করেছিলেন। পায়েসপুরের শার্লক হোমস তিনিই। খগেন এবার ছোট চোখে নগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুধু 'পঁচাত্তর বছর পরই' বলেননি, তার আগে আপনি 'এসে গিয়েছে' কথাটাও ব্যবহার করেছেন। তারও আগে বলেছেন 'কাবলিওয়ালা' বা 'সবরিকলা' বা ওই ধরনের কিছু। তিনটে কথাকে পরপর সাজালে দাঁড়াচ্ছে, কাবলিওয়ালা এসে গিয়েছে পঁচাত্তর বছর পর। ঠিক কিনা নগেনদা?"

নগেন সর্বাধিকারী খুবই অপ্রস্তুত হয়ে হঠাৎ ব্যস্তসমস্তভাবে কোঁচা ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, "উঠি হে হলধর, ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে!"

সবাই হইহই করে উঠলেন। নিমাই বিশ্বাস উঠে সদর দরজার ছিটকিনি এঁটে তাতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "উঁহু, অত সহজে ছাড়া পাবেন না নগেনদা! ব্যাপারটা খোলসা করে বলুন। যদি কোনও বিপদআপদ হয়ে থাকে, তো আমরা আছি কী জন্য? সব খুলে বলুন, আমরা জান লড়িয়ে দেব।"

নগেনবাবু খুব অসহায় মুখ করে ফের বসে পড়লেন। নগেনবাবু আমুদে লোক হলেও ভারী নিরীহ আর ভিতু মানুষ। বসে ভারী জলে-পড়া ভাব করে সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগলেন। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, "আমার সত্যিই বড় বিপদ।"

"আহা, সেটাই তো সবাই শুনতে চাইছি।"

"কিন্তু বলায় যে বারণ আছে!"

"কার বারণ?"

"তাকে তোমরা চিনবে না। তবে সে বড় ভয়ংকর লোক।"

নিমাই বিশ্বাস বললেন, "এ গাঁয়ে বা আশপাশে যারা আছে তাদের নাড়িনক্ষত্র আমি জানি। ষন্ডা-গুন্ডা নেই তা বলছি না, কিন্তু ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হবে এমন মারকুট্টা তো কাউকে মনে পড়ছে না।"

"না না, সে এদিককার লোকই নয় হে! আজকের লোকও নয়। সে পঁচাত্তর বছর আগে এসেছিল।"

ব্রজেন বোস চোখ কপালে তুলে বললেন, "বলো কী হে! পঁচাত্তর বছর আগে এসেছিল! তা হলে তো সে থুত্থুড়ে বুড়ো মানুষ!"

নগেন সর্বাধিকারী মাথা নেড়ে বললেন, "না হে ব্রজেন, সে মোটেই বুড়ো নয়। বেশ তাগড়াই জোয়ান চেহারা।"

নিমাই বিশ্বাস অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললেন, "জোয়ান চেহারা বলছেন! পঁচাত্তর বছর আগে তার কত বয়স ছিল?"

"তা ধরো পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন তো হবেই।"

"তা হলে হিসেবে দাঁড়ায়, তার বয়স এখন একশো পঁচিশ থেকে তিরিশ। বেঁচে থাকারই কথা নয়। আর যদিও-বা বাইচান্স বেঁচে থাকেও, তা হলে তার খুনখনে বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথা!"

নগেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেটাই তো চিন্তার কথা!"

"আপনি লোকটাকে ভয় পাচ্ছেন কেন তা বুঝতে পারি না। পঁচাত্তর বছর আগের কোনও লোক কী করে এসে আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে?"

"তার আসবার কথাই ছিল। সে বাবাকে বলে গিয়েছিল ঠিক পঁচাত্তর বছর পরে সে এসে জিনিসটা ফেরত নিয়ে যাবে।"

"জিনিস! কী জিনিস বলুন তো?"

নগেন সর্বাধিকারী একটু চুপ করে রইলেন। তারপর গলাটা একটু চেপে বললেন, "তা হলে তোমাদের সব খুলেই বলতে হয়। তখন আমার বয়স বছর দশেক। তখন আমরা বড্ড গরিব ছিলুম। সামান্য জমিজমা থেকে যে আয় হত তাতে গ্রাসাচ্ছাদন চলত না। ভাঙা ঘরে বাস, আধপেটা খাওয়া বা উপোস, জামাকাপড়, জুতো, ছাতা সবই অমিল। ঠিক সেই সময় একদিন দুপুরের দিকে এক পেল্লায় চেহারার, জটাজুটধারী, রক্তাম্বর পরা সাধু গোছের লোক এসে হাজির। অভাবে পড়ে তখন আমাদের এমন অবস্থা যে, দৈবের উপর বড় বেশি নির্ভরতা এসে গিয়েছিল। সাধু দাওয়ায় বসে বাবার সঙ্গে কিছু কথাটথা কইল, মনে আছে, একঘটি জলও খেল ঢকঢক করে। তারপর ঝোলা থেকে একটা জিনিস বের করে বাবার হাতে দিয়ে বলল, 'তোকে এটা দিয়ে যাচ্ছি। যদি ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারিস, তা হলে বেঁচে যাবি। যদি লোভ করিস, তবে মরবি। আরও একটা কথা, ঠিক পঁচাত্তর বছর পর আমি আমার জিনিস ফেরত নিতে আসব। যদি জিনিসটা বেহাত হয় বা হারিয়ে যায়, তা হলে কিন্তু নির্বংশ করে দিয়ে যাব। তোর ছেলেপুলে বা বংশধরদের হুঁশিয়ার করে দিস!' "

হলধর বললেন, "এ তো হিন্দি ছবির গপ্পো!"

গজপতি বলে উঠলেন, "আরে না না, এ হল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের বৃত্তান্ত। না নগেনদা, এ জিনিস চলবে না।"

নগেন পাংশু মুখে বললেন, "এই জন্যই বলতে চাইছিলাম না। জানি তোমাদের বিশ্বাস হবে না! তা হলে এই পর্যন্তই থাক!"

ব্রজেন বললেন, "আরে চটো কেন ভায়া? আমার তো দিব্যি বিশ্বাস হচ্ছে! কেউ কথা কইলেই ওদের ফুট কাটার স্বভাব।"

নিমাই অবাক হয়ে বললেন, "আমি তো হাঁ করে শুনছি। গায়ে কাঁটাও দিচ্ছে, এই দেখুন!"

খগেন বললেন, "আমারও তো বাপু মোটেই অবিশ্বাস হচ্ছে না।"

নগেন ফের একটা বড় শ্বাস মোচন করে বললেন, "বিশ্বাস করা না-করা তোমাদের ইচ্ছে। যা ঘটেছিল তাই বলছি।"

সবাই সমস্বরে সম্মতি জানালে নগেন বললেন, "গজপতি ঠাট্টা করলেও কথাটা ভুল বলেনি। সাধুবাবা একটা প্রদীপই দিয়েছিল বাবাকে, ছোট্ট, এই আমার মুঠোর সমান মাপের একটা পেতল বা ওই ধরনের ধাতুর প্রদীপ।"

নিমাই সাগ্রহে বললেন, "সোনার নয় তো?"

"তাও হতে পারে। যাচাই করে দেখা হয়নি। কারও হাতে দেওয়া বারণ ছিল। শুধু বাবাই ওটা নিয়ে ঘর বন্ধ করে কী সব প্রক্রিয়া করতেন। আগেই বলে রাখি, আমরা প্রদীপ থেকে কোনও দৈত্যদানো বেরিয়ে আসতে দেখিনি, রাতারাতি বড়লোকও হয়ে যাইনি। প্রদীপটা বাবার হাতে আসার পর কিন্তু ধীরে-ধীরে আমাদের অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। খাওয়া-পরার এত কষ্ট আর ছিল না। বাবা পুরনো ভদ্রাসন ছেড়ে নতুন পাকাবাড়ি করে উঠে এলেন।"

হলধর বিরক্ত হয়ে বললেন, "বোগাস ব্যাপার। প্রদীপের সঙ্গে আর্থিক উন্নতির সম্পর্কটা কী? এসব তো রূপকথার গল্প।"

নগেন মিইয়ে গিয়ে বললেন, "ওই জন্যই তো বলতে চাইনি। তোমাদের চাপাচাপিতে বলতে হল। এ গপ্পো বিশ্বাস না করো ক্ষতি নেই, কিন্তু একথা অতি নির্জলা সত্যি যে, সেই সাধুবাবা ঠিক পঁচাত্তর বছর পর ফিরে এসেছে।"

গজপতি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "প্রায় দেড়শো বছর বয়সে?"

"হ্যাঁ। সে কী চেহারা রে বাবা, যেন বাঘ! চোখ দু'খানা দিয়ে যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে! দুপুরবেলা এসে বজ্রগম্ভীর স্বরে আমার নাম ধরে ডাকল। সেই সাধু যে সত্যিই তার জিনিস ফেরত নিতে পঁচাত্তর বছর পর হাজির হবে, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ভেবেছিলাম, গুল মেরে গিয়েছে। কিন্তু সে আমার বাবার নাম করে আদ্যোপান্ত ঘটনাটা বলে যখন প্রদীপটা ফেরত চাইল, তখন অবিশ্বাস করি কী করে? আমি ছাড়া সেই ঘটনার তো আর সাক্ষী নেই!"

খগেন বললেন, "তা প্রদীপটা দিয়ে দিলেন নাকি তাকে?"

নগেন প্রবল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "পারলাম কই? প্রদীপ বের করতে গিয়ে দেখি, ঠাকুরের সিংহাসনের তলায় তালা দেওয়া যে ভারী কাঠের বাক্সে তা ছিল, সেটা ফাঁকা। প্রদীপের চিহ্নমাত্র নেই। প্রদীপ পাওয়া যাচ্ছে না শুনে সাধুর কী রাগ! শরীরটা যেন দু'নো হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। বলল, 'সাত দিনের মধ্যে যদি প্রদীপ না দিস, তা হলে ঝাড়েবংশে মারা যাবি।' এই বলে সাধু চলে গেল। সেই থেকেই আমি বড় ভেঙে পড়েছি ভাই!"

হলধর উঠে পায়চারি করতে-করতে হাত নেড়ে বললেন, "বোগাস-বোগাস, অল বোগাস। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন নগেনদা, বায়োলজিক্যাল নিয়মেই আপনার সেই সাধুবাবা অনেক আগেই টেঁসে গিয়েছে। এখন কোনও একটা ইম্পস্টার এসে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে। আপনি পুলিশে খবর দিন এবং ক্লাবের ছেলেদের অ্যালার্ট করুন! বেগতিক বুঝলেই সাধু পালাবার পথ পাবে না।"

এ কথায় নগেন বিশেষ ভরসা পেলেন বলে মনে হল না।

॥ ২ ॥

লম্বু দানু যে খুব ওস্তাদ ফুটবল খেলোয়াড় তা নয়। সে ল্যাকপ্যাক করে লম্বা-লম্বা পায়ে ছোটে বটে, কিন্তু ড্রিব্‌ল করতে গিয়ে বারবার আছাড় খায় আর হি হি করে হাসে। বলে শট করতে গিয়ে উলটে পড়েও যায়। বেজায় লম্বা বলে তার হেড করা বল সব সময়েই বারের উপর দিয়ে চলে যায়। এসব নানা গোলমাল থাকলেও সে কিন্তু কাজের কাজটা ঠিকই করে দেয়। যখনই দল হারতে বসে তখনই ঠিক লম্বু দানু একটা-দু'টো গোল দিয়ে দলকে জেতাবেই কী জেতাবে। আর এই জন্যই রায়পাড়ার শীতলা ক্লাবের সেক্রেটারি কাম কোচ কালীপদ ঘোষ ঠিক করেছেন, দানুকে হবিবপুর গ্রামের ইলেভেন টাইগার্সদের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচটায় খেলাবেন। তবে এই নিয়ে একটু বিতর্কও দেখা দিয়েছে। কারণটা হল, দানু শীতলা ক্লাবের মেম্বার তো নয়ই, এমনকী, রায়পাড়ার বাসিন্দাও নয়। তার চেয়েও বড় কথা, সে পায়েসপুরেও নবাগত। তার বাড়ি প্রতাপগড়ে। বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বলে পায়েসপুরে এসে জুটেছে। সুতরাং হবিবপুরের ইলেভেন টাইগার্স যদি বুঝতে পারে যে, শীতলা ক্লাব একজন বহিরাগতকে খেলাচ্ছে, তা হলে ম্যাচ বাতিল হয়ে হবিবপুর ওয়াক ওভার পেয়ে যেতে পারে। সুতরাং দানুকে খেলানো উচিত হবে কি না সেই নিয়ে ক্লাব-কর্তৃপক্ষ এখনও পাকা সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

শীতলা ক্লাবের ফুটবল ক্যাপ্টেন প্রাণারাম অবশ্য দানুকে খেলানোর পক্ষে। কারণ, দানু বলতে গেলে তারই আবিষ্কার, মাস দুই আগে একদিন সন্ধেবেলা তার পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে একটা ঝাঁকড়া চুলওয়ালা ঢ্যাঙা ছেলেকে উঁকি দিতে দেখে সে ভারী চমকে গিয়েছিল। প্রাণারাম চেঁচিয়ে উঠেছিল, "কে! কে রে তুই?"

ছেলেটি বড়-বড় দাঁত বের করে হেসে বলল, "কিছু কাজটাজ করে দিতে হবে?"

"কাজ! কিসের কাজ?"

"যে-কোনও কাজ।"

"কাজ করতে চাস কেন?"

"কাজ করলে চাট্টি খেতে পাওয়া যায়। নইলে তো কেউ খেতে দেয় না। তাই কাজ খুঁজছি।"

শুনে প্রাণারামের একটু দয়া হল। সে চুপিচুপি রান্নাঘর থেকে কয়েকটা রুটি আর একটু গুড় এনে দিল। ছেলেটি বারান্দায় বসে খুব যত্ন করে রুটি খেল। প্রাণারাম বলল, "তুই কী কী কাজ করতে পারিস?"

"যা বলবে সব করে দেব।"

"আমার পিসির বাড়িতে মস্ত একটা ভীমরুলের চাক হয়েছে। কেউ ভয়ে সেটা ভাঙতে পারছে না। ভেঙে দিতে পারবি?"

ছেলেটা ঘাড় কাত করে বলল, "খুব পারব। এ তো সোজা কাজ। আমি অনেক ভীমরুলের চাক ভেঙেছি।"

"ঠিক আছে, কাল সকালে আসিস।"

ছেলেটি রাজি হয়ে চলে গেল এবং পরদিন সকালে ঠিক এসে হাজির হল। প্রাণারামের পিসি সরযূদেবী অনাথা বিধবা। ছেলেপুলে নেই। বিরাট বাড়িটায় একা থাকেন।

সরযূদেবীর দোতলার বারান্দায় ভীমরুলের বিশাল চাকটা দেখলে ভয় হওয়ারই কথা। প্রায় দু' হাত লম্বা আর থামের মতো মোটা মেটে রঙের চাক। সর্বদাই ভীমরুলরা ভনভন করছে চারদিকে। কিন্তু দানু বিন্দুমাত্র ঘাবড়াল না। নারকোলের ছোবড়া জ্বেলে ধোঁয়া তৈরি করে আধঘণ্টার মধ্যে ভীররুলদের চাকছাড়া করে দা দিয়ে চাকটা কেটে পুকুরপাড়ে নিয়ে গিয়ে ভেঙে ফেলল।

পিসি ভারী খুশি হয়ে দু'টো টাকা দিতে গেলেন, কিন্তু দানু নিল না। বলল, "দুপুরে দু'টো ভাত দেবেন, তা হলেই হবে।"

পিসি বললেন, "তা দেব বাবা।"

প্রাণারাম বলল, "ও পিসি, দানু তো বাপে তাড়ানো ছেলে! ওকে তোমার কাছেই রেখে দাও না কেন!"

পিসি একটু সন্দিহান হয়ে বললেন, "চোরছ্যাঁচোড় নয় তো?"

কথাটা দূর থেকেও কী করে যেন শুনতে পেল দানু। একগাল হেসে বলল, "না পিসি, আমি চোরছ্যাঁচোড় নই। ঘরদোরে থাকতে না দেন তো নীচের বারান্দাতেই পড়ে থাকতে পারি।"

তা সেই থেকে দানু সরযূদেবীর বাড়িতেই আছে। দেখা গেল, সে খুবই কাজের ছেলে। পিসির চল্লিশ-পঞ্চাশটা নারকোল গাছের পুরুষ্টু নারকোল সব দু'-চারদিনের মধ্যে পেড়ে ফেলল সে। তারপর বিরাট পুকুরের সব কচুরিপানা তুলে ফেলল। বাগান পরিষ্কার করে মাটি কুপিয়ে নতুন গাছের চারা লাগাল। হাটবাজার করা, কাঠ কাটা, কুয়োর জল তোলা, সব কাজেই সে বেশ পোক্ত। কয়েকদিনের মধ্যেই সরযূদেবী তাকে ভারী ভালবেসে ফেললেন। এখন তাঁর দানু ছাড়া এক

মুহূর্ত চলে না। একদিন প্রাণারামকে বলেই ফেললেন, "বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছে রে! ছেলেটিকে পুষ্যি নেব কিনা ভাবছি।"

সেদিন শীতলা ক্লাবের সঙ্গে বাবুপাড়ার ওল্ড ফাইটার্স ক্লাবের ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। কিন্তু শীতলা ক্লাবের দু'-দু'জন বাঘা প্লেয়ারের জলবসন্ত হয়েছে। চিন্তিত প্রাণারাম এসে দানুকে বলল, "হ্যাঁ রে, তুই ফুটবল খেলতে পারিস?"

দানু ঘাড় কাত করে একগাল হেসে বলল, "খুব পারি! একবার চান্স দিয়েই দ্যাখো না!"

উপায় ছিল না বলে সেদিন শীতলা ক্লাবের দলে দানুকে নামানো হল। কিন্তু দানুর খেলা দেখে সবাই হেসেই অস্থির। লম্বা পায়ে তার লগবগ করে দৌড় আর দড়াম-দড়াম করে আছাড় খাওয়া দেখে একবার তাকে বসিয়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিল প্রাণারাম। মাঠের চারদিকে জড়ো হওয়া দর্শকদের মধ্যে হাসির লহর বইছে। তার মধ্যে অবশ্য গাঁয়ের সবচেয়ে বোকা লোক হরিবন্ধু নফরও ছিলেন। তিনিই শুধু বলেছিলেন, "এই ছেলেটির সঙ্গে মারাদোনার খুব মিল।"

এ কথা শুনে পাশে বসা সুধীরবাবু চটে উঠে বললেন, "এর সঙ্গে মারাদোনার মিল আর বাঘের সঙ্গে খরগোশের মিল একই কথা। মারাদোনা বেঁটে, হোঁতকা, আর এ হল ঢ্যাঙা আর রোগা। তা হলে মিলটা পেলে কোথায়?"

হরিবন্ধু আমতা-আমতা করে বললেন, "তা বটে! তবে একটা কেমন মিলও যেন আছে। পেটে আসছে, মুখে আসছে না।"

যাই হোক, হাফটাইমের মধ্যেই ওল্ড ফাইটার্স শীতলা ক্লাবকে তিন গোল দিয়ে বসল।

হাফটাইমে দানুকে বসিয়ে দেওয়ার কথা উঠতেই কালীপদবাবু বললেন, "তোমরা হয়তো লক্ষ করোনি, দানু খেলা না জানলেও প্রচুর দৌড়তে পারে, আর ল্যাং খেয়েও দমে যায় না। এ দু'টো গুণের জন্য ওকে খেলানোই উচিত হবে। তা ছাড়া আমাদের প্লেয়ারও শর্ট।"

হাফটাইমের পর খেলা শুরু হতেই কিন্তু দেখা গেল, মাঝমাঠ থেকে বল ধরে দানু লম্বা-লম্বা পায়ে দৌড়চ্ছে। বারদুয়েক ল্যাং খেয়ে পড়ে গেল বটে, কিন্তু ফের উঠে দৌড়ে গিয়ে বল ধরে ফেলল। তারপর এর-ওর-তার পায়ের ফাঁকফোকর দিয়ে কী করে যেন ফাইটার্সদের গোলে বলটা ঢুকিয়ে দিল। মাঠের চারদিকে হইহই উঠল। এর পরের গোলটা দানুই দিল প্রায় সেই একই ভঙ্গিতে। তবে এবার খুব এঁকেবেঁকে দৌড়ে কয়েকজনকে পাশ কাটিয়ে শেষে হাঁটুর গুঁতোয় গোল। এমন আনাড়ির কাছে গোল খেয়ে ওল্ড ফাইটার্সরা খেপে উঠে দানুকে প্রায় ঘিরে ফেলতে লাগল। সে বল ধরলেই চার-পাঁচজন এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ল্যাং মারা, জামা বা হাত ধরে টানা, কনুই দিয়ে পাঁজরে মারা, কিছুই বাকি রাখল না তারা। কিন্তু দানুকে তবু রোখা গেল না। দশ মিনিটের মাথায় সে অনেক দূর থেকে একটা এমন আনতাবড়ি ভলি মেরে বসল যে, সেটা কামানের গোলার মতো গিয়ে ফাইটার্সের গোলে সেঁধিয়ে গেল। শোধবোধ। খেলা শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে যখন গোল করার জন্য গোটা ফাইটার্স দল শীতলা ক্লাবের পেনাল্টি বক্সে উঠে এসেছে, তখন প্রাণারাম হঠাৎ পায়ে বল পেয়ে ফাঁকা জমিতে ঞ্চ বাড়িয়ে দিল, যদি কেউ সেটা ধরে গোল করতে পারে। পারল দানুই। কারণ, সে এত জোরে ছোটে যে, কেউই তার সঙ্গে গতিতে তাল রাখতে পারে না। একা বল ধরে ফাঁকা মাঠে লম্বা পায়ে এক লহমায় গোলের মুখে পৌঁছে গেল দানু। ওদের গোলকিপার ড্রাইভ দিয়ে পানুর পা জড়িয়ে ধরে ফেলে দিল বটে, কিন্তু বলটা ছিটকে গোলে ঢুকেও গেল।

সেই থেকে দানু শীতলা ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়। যদিও সে পাস দিতে জানে না, ড্রিব্‌ল করতে গেলেই পড়ে যায়, নিজের জায়গায় পজিশন নিতে ভুলে যায়, তবু রোজই নানা কিম্ভূত উপায়ে একটা-দু'টো গোল ঠিকই দিয়ে দেয়।

একদিন প্রাণারাম দানুকে ডেকে বলল, "দ্যাখ দানু, তোর মধ্যে কিন্তু প্রতিভা আছে। কিন্তু অত আনাড়ির মতো খেলিস কেন? কায়দাকানুন একটু শিখলে হয় না?"

দানু উদাস হয়ে বলল, "কাজ কী শিখে? তুমি তো গোল চাও, সেটা হলেই তো হল!"

"তা বটে! কিন্তু অপোনেন্ট প্লেয়াররা যে তোকে এত ল্যাং মারে, তোর ব্যথা লাগে না? যেদিন মনোজ তোর হাঁটুতে বুট চালিয়েছিল, তাতে মালাইচাকি চৌচির হয়ে যাওয়ার কথা!"

দানু একগাল হেসে বলল, "লাগবে না? খুব ব্যথা লাগে। তবে কী জানো, কষ্ট করে বড় হয়েছি তো, তাই ব্যথা সহ্য করতে পারি। আমার হাড়গোড় খুব শক্ত।"

"তাই দেখছি, ঠিক আছে, তুই তোর মতোই খেলিস।"

আন্তঃজেলা লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হবিবপুরের ইলেভেন টাইগার্সের সঙ্গে তাদের গাঁয়ে খেলতে গিয়েছিল শীতলা ক্লাব। গিয়ে হাজির হতেই হবিবপুরের লোকেরা এসে একজনেরই খোঁজখবর করতে লাগল, "দানু কে? দানু কোথায়? কোন ছেলেটি দানু বলো তো!"

বোঝা যাচ্ছিল, আজ ম্যাচে দানুর কপালে দুঃখ আছে। কালীপদ ঘোষ আর প্রাণারাম মিলে ঠিক করল, আজ দানুকে মাঠে না নামিয়ে রিজার্ভে রাখা হবে। কেননা, আজ ওদের লক্ষ্যই হবে দানুকে মেরে অকেজো করে দেওয়া।

কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই টাইগাররা দুর্দান্ত খেলে দু'টো গোল দিয়ে দিল। আরও দু'টো দিতে পারত, অল্পের জন্য হল না। বিপদ বুঝে হাফটাইমের পর দানুকে নামানো হল। দানু শুধু একবার প্রাণারামকে জিজ্ঞেস করল, "ক'টা গোল করতে হবে বলো তো?"

প্রাণারাম হেসে বলল, "য'টা চাইব ত'টা গোল দিতে পারবি? যা, তা হলে পাঁচ গোল দিস।"

দানু তার স্বভাবসিদ্ধ অষ্টাবক্র মুনির মতো লম্বা শরীর এবং লম্বা-লম্বা পায়ে এমন এঁকেবেঁকে সারা মাঠ জুড়ে দাপাতে লাগল যে, লোকে হাঁ। এবং নামবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একখানা ধাঁই শটে গোল। কিন্তু গোল করার পরও টাইগার্সদের ব্যাক বিপ্লব বুটসুদ্ধ পায়ে দানুর বুকে একটা লাথি জমিয়ে দিতে ছাড়েনি। দানু অবশ্য একটু গড়াগড়ি দিয়ে ফের খাড়া হয়ে তার কাঁকড়ার ভঙ্গিতে খেলা শুরু করে দিল। পাঁচ মিনিটের মাথায় হাফলাইনের কাছ থেকে একখানা রামধনু শট করে বসল দানু। আর সেটা উপরে উঠে গোত্তা খেয়ে গোলকিপারের মাথা টপকে গোলে ঢুকল। যথারীতি ফের খেলা শুরু হতেই দানুকে লক্ষ করে চোরাগোপ্তা মার, লাথি, পায়ের ডিমে মারা, মাথায় কনুই দিয়ে ঠুকে দেওয়া, এসব চলতে লাগল বটে, কিন্তু বিশেষ সুবিধে হল না। বরং দানুকে চার্জ করতে গিয়ে ওদের গোটা দুই প্লেয়ারের ভালরকম চোট হয়ে মাঠ ছাড়তে হল। ফ্রি-কিক থেকে আরও একটা গোল দিল দানু। খেলার শেষ দিকটায় হ্যাঁদানো টাইগার্সদের দম ফুরিয়ে আসছিল। অনায়াসে আরও দু'টো গোল দিয়ে দিল দানু। দলের সবাই এসে জড়িয়ে ধরল দানুকে। প্রাণারাম পিঠ চাপড়ে বলল, "ওঃ, আমার মুখ রেখেছিস!"

কিন্তু রক্ষার আরও বাকি ছিল। নিজেদের ঘরের মাঠে পাঁচ-পাঁচটা গোল হজম করা হবিবপুরের মারকুট্টা লোকদের পক্ষে খুব শক্ত ব্যাপার। খেলার শেষে আপ্যায়নের পর তারা যখন একটা খোলা ট্রাকে চেপে ফিরছে, তখন রথতলার কাছে দেখা গেল, পথ জুড়ে একটা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। ট্রাকটা থামতেই দু'পাশ থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে জনাকুড়ি-পঁচিশ ছেলে তেড়ে এসে দমাদম লাঠি আর হকিস্টিক নিয়ে বেধড়ক মারতে শুরু করল তাদের। প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়ে সবাই পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু গুন্ডারা এমন ভাবে ঘিরে ধরেছে যে, পালানো অসম্ভব। মারের চোটে তাদের প্রাণসংশয়। ঠিক এই সময় লগবগে, রোগা, আপাতনিরীহ দানু কিন্তু ফস করে একজনের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে একাই এমন পালটা মার দিতে শুরু করল, যা অবিশ্বাস্য। লাঠি সেও কম খেল না। কিন্তু সেসব গ্রাহ্য না করে সে এমন লাঠিবাজি করে যাচ্ছিল যে, প্রতিপক্ষ রণেভঙ্গ দিয়ে পালাতে পথ পায় না।

গাঁয়ে ফিরে দানু বীরের সম্মান পেল বটে, কিন্তু তাতে তার বিশেষ হেলদোল নেই। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে সে সরযূদেবীর বাড়িতে ফিরে নিজের কাজকর্ম সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রাণারাম এসে বলল, "হ্যাঁ রে দানু, একটা সত্যি কথা বলবি? মাঝে-মাঝে কি তোর উপর কোনও দৈবশক্তি ভর করে? পাঁচ-পাঁচটা গোল করলি, সে না হয় হল! কিন্তু কুড়ি-পঁচিশটা ছেলের সঙ্গে লড়াই করলি কী করে?"

দানু নির্বিকার মুখে বলল, "না লড়লে যে মার খেতে হত!"

প্রাণারাম মাথা নেড়ে বলল, "না রে, তুই সোজা লোক নোস। তোর ভিতরে কিছু একটা আছে।"

পায়েসপুরের বীর বলে এতকাল খ্যাতি ও খাতির ছিল বটেশ্বরের। তা বটেশ্বরের চেহারা পেল্লায়। সে তেমন লম্বা নয় বটে, কিন্তু চওড়ায় পুষিয়ে নিয়েছে। সারা শরীরে পেশির বন্যা। বটেশ্বর নড়লেই শরীরের গোল্লা-গোল্লা পেশি পান্তুয়ার মতো ভেসে ওঠে। বীরত্বের কাজ সে এখনও তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি বটে, কিন্তু দরকার পড়লে যে করবে, সেই ভরসা গাঁয়ের মানুষদের আছে। সে মোটা-মোটা লোহার রড বাঁকাতে পারে, এক প্যাকেট তাস দু' হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, তিন-চার মন ওজন তুলতে পারে। দানুর কীর্তি-কাহিনি শুনে সে নাক সিটকে বলল, "ওই হাড়গিলে ছেলেটা! দুর-দুর, ও আবার কী মারপিট করবে? আমি জোরে ফুঁ দিলেই তো উড়ে যাবে!"

হারাধনবাবুকে এক হিসেবে দেশপ্রেমিক বলা যায়। তিনি অবশ্য ভারতবর্ষের খবরাখবর তেমন জানেন না, প্রদেশ বা জেলা বা এমনকী মহকুমা নিয়েও তাঁর তেমন মাথাব্যথা নেই। তাঁর মতে পায়েসপুরই হচ্ছে পৃথিবীর সেরা জায়গা। কাজেই পায়েসপুরের গৌরবেই তিনি সর্বদা গৌরবান্বিত। সর্বদাই তিনি সকলকে পায়েসপুরের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এই পায়েসপুরেই নাকি একদা রাজা মানসিংহের সৈন্যরা আমবাগানের ছায়ায় জিরিয়েছিল, আর তাদের ঘোড়াগুলো জল খেয়েছিল ময়নামতীর দিঘিতে। গোরাদের আমলে দু'জন সাহেবও নাকি পায়েসপুরের বিখ্যাত ডাকাত বিষ্ণু বাগদিকে গ্রেফতার করতে আসে। তারা কবুল করে গিয়েছিল যে, এরকম ডাকাবুকো ডাকাত তারা কস্মিনকালেও দেখেনি। প্রতাপগড়ের গৌরবের আমলে রাজা বীরবিক্রম নাকি এই পায়েসপুরের চাটাইয়ের খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। এক সময় পায়েসপুর নাকি মিষ্টি কুমড়োর চাষে ভারতবর্ষের এক নম্বর ছিল এবং মেটে কলসি তৈরিতে এই পায়েসপুরের মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে কেউ এঁটে উঠত না। ইতিহাসবিশ্রুত হয়ে আছে এই গাঁয়ের অতি বিচক্ষণ চোর সর্বেশ্বর। আর পণ্ডিত বিনোদবিহারীর নামও সবাই জানে। যিনি বাংলা ব্যাকরণ 'দীপশিখা' লিখে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। এ গাঁয়ের এখনকার গৌরবও বড় কম নয়। বনমালীবাবু এত ভাল ইংরেজি জানতেন যে, গোরা ম্যাজিস্ট্রেট নাকি বলেছিলেন, 'বনমালী কাছে থাকলে কারও ডিকশনারি খোলার দরকার হয় না।' বনমালীবাবু আটানব্বই বছর বয়সে এখনও বেঁচে আছেন। এ গাঁয়েরই রায়পাড়ার বাসব নন্দী কেশবপুরের জমিদারের ছোট মেয়ের বিয়েতে আশিটা রসগোল্লা খেয়ে যে খবরের কাগজে নাম তুলেছিল, সেটাও ভুলে গেলে চলবে না। খবরের কাগজের কাটিং হারাধন যত্ন করে ফাইলে রেখে দিয়েছেন। হারাধন বিশ্বাস করেন বটেশ্বর একদিন 'ভারতশ্রী' এবং তারপর 'বিশ্বশ্রী' হয়ে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে। তাই তিনি প্রায়ই বটেশ্বরকে তাড়না করেন, "ওহে, উঠে পড়ে লাগো তো! বুক ফুলিয়ে গিয়ে বিশ্বশ্রী হয়ে ইউ এন ও-তে পায়েসপুরের নিশান উড়িয়ে দিয়ে এসো!"

বোকা হরিশঙ্কর একটু ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "পায়েসপুরের কি আলাদা নিশেন আছে হারুখুড়ো?"

হারাধন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "তা থাকবে না কেন? নিশ্চয়ই

ছিল। কিন্তু সেই ঐতিহ্য আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ওরে, নিশেন তৈরি তো আর শক্ত নয়। তিন টুকরো রঙিন কাপড় জুড়লেই একটা নিশেন খাড়া করা যায়। শক্ত কাজ হল সেটাকে বিশ্বের বুকে উড়িয়ে আসা। আর বটেশ্বর সেটা ঠিক পারবে। যে হারে মাস্‌লগুলো দিন কে-দিন কিলবিলিয়ে উঠছে, তাতে একদিন নোবেল প্রাইজও এনে ফেলবে, দেখিস!"

গোবিন্দ অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু খেলাধুলো বা স্বাস্থ্যের জন্য তো নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় না!"

হারাধন গলা তুলে বললেন, "কে বলল দেওয়া হয় না? এই যে সেদিন নর্মদাদিদির হাতের রান্না নিমসুক্তো আর চাপড় ঘণ্ট খেয়ে তাঁর নাতজামাই বলে গেলেন, 'আপনাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত!' সে কী ফাঁকা কথা? সেই নাতজামাই কোন ইউনিভার্সিটির যেন প্রোফেসর। তিনি কি না জেনে বলেছেন? তা রান্নাবান্নায় যদি নোবেল থাকে, তা হলে স্বাস্থ্যের খাতেও আছে।"

গোবিন্দ একটু মিইয়ে গিয়ে বলল, "সেরকমই যেন শুনেছিলাম।"

তা বটেশ্বরের এত বড় ভক্ত হারাধনবাবু দানুর বীরত্বের কথা শুনে দানুর দিকে একেবারে ঢলে পড়েছেন। ঘটনার পরদিনই গিয়ে দানুকে বলে এসেছেন, "বুঝলি দানু, উনিশশো বত্রিশ সালে এ গাঁয়ের রমেশ কুমোর হাত দিয়ে বাঘ মেরেছিল, আর তারপর এই তুই। পায়েসপুরের ইজ্জত রেখেছিস, মুখোজ্জ্বল করেছিস। এবার অলিম্পিকের জন্য তৈরি হ'। পায়েসপুর তোর মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে বাবা!"

বীরেশ বলল, "তা কী করে হবে? ও তো পায়েসপুরের ছেলে নয়? ওর বাড়ি প্রতাপগড়ে।"

হারাধন খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "বললেই হবে প্রতাপগড়ে? সেখান থেকে তো ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পায়েসপুরের সম্মান রাখতে দরকার হলে আমি ওকে পুষ্যি নেব।"

সময়টা খারাপই যাচ্ছে বটেশ্বরের। এই ক'দিন আগেও রাস্তায় বেরোলে আশপাশের লোকেরা কথা থামিয়ে হাঁ করে চেয়ে দেখত। হাটেবাজারে লোকজন বিকিকিনি থামিয়ে এ-ওকে ডেকে দেখাত, 'ওই দ্যাখ, বটবৃক্ষ যাচ্ছে!' পানুবাবুর সঙ্গে পথে দেখা হলেই বিগলিত হাসির সঙ্গে হেঁ-হেঁ করতে-করতে আর হাত কচলাতে-কচলাতে পানুবাবু বলতেন, "হেঁ-হেঁ, কী স্বাস্থ্য! কী স্বাস্থ্য! দেখলেও চোখ সার্থক। হেঁ-হেঁ, কী পেশিই বানিয়েছেন বটুবাবু, যেন জলের মধ্যে মাগুরমাছ খেলে বেড়াচ্ছে! হেঁ-হেঁ, এই যে এত মাস্‌লের বোঝা নিয়ে হেঁটেচলে বেড়ান, একটু ভারী-ভারী লাগে না?"

তা বটেশ্বরের সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। বটেশ্বর এখনও রাস্তায় বেরোয় বটে, কিন্তু লোকজন তাকে যেন তেমন লক্ষই করে না। বরং অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। হাটেবাজারে বটেশ্বরকে দেখা তো দূরের কথা, সেদিন একটু কাঁচালঙ্কা ফাউ চেয়েছিল বলে লঙ্কাওয়ালা এমন খ্যাঁক করে উঠল যে, বটেশ্বর ভারী অপমানিত বোধ করেছিল। বটেশ্বর বুঝতে পারছে যে, পায়েসপুরে তার একচ্ছত্র আধিপত্য আর নেই। আর এসবের মূলে ওই ল্যাকপ্যাকে, হাড়গিলে চেহারার ঢ্যাঙা দানু। এই যে তার একনিষ্ঠ ভক্ত পানুবাবু, দেখা হলে আজকাল আর হাসি নেই, বিস্ময় নেই, হেঁ-হেঁ পর্যন্ত নেই। মুরুব্বির মতো একটু ঘাড় হেলিয়ে গম্ভীর গলায় শুধু বলেন, "চালিয়ে যান বটুবাবু।"

দুঃখী বটেশ্বর তাই বিকেলের ব্যায়াম-ট্যায়াম সেরে এক সন্ধেবেলা মাঠের ধারে একা-একা বসে দুঃখের কথাই ভাবছিল। দানু ফুটবল খেলা জানে না, অথচ গোল দেয়। তার চেহারা ল্যাকপ্যাকে হলেও গায়ের জোরে কেউ তার সঙ্গে পারে না। সে দু'দিনে তিরিশ-চল্লিশটা গাছের সব ফল পেড়ে ফেলতে পারে। একদিনে বিরাট পুকুরটার সব কচুরিপানা তুলে ফেলে। এসব হচ্ছেটা কী? ভগবানের এ কী অবিচার রে বাবা! সে এত কষ্ট করে বুকডন-বৈঠকি মেরে, বারবেল-ডাম্বেল-মুগুর ভেঁজে মাস্‌ল ফোলাল, আর বীরের সম্মান পেয়ে গেল হাড়গিলে ঢ্যাঙা দানু! তা হলে ব্যায়ামট্যায়াম করে লাভ হল কী?

আকাশে মেঘটেঘ ছিল না, দুযোর্গের কোনও আভাসও নেই। কিন্তু হঠাৎ একটা বিকট বজ্রপাতের শব্দে আঁতকে উঠে বটেশ্বরের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মাথায় হাত দিয়ে চোখ বুজে ফেলেছিল সে। চোখ চেয়ে দেখল, সামনে এক বিভীষিকা দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল লম্বা-চওড়া চেহারার রক্তাম্বর পরা এক সাধু। হাতে পেল্লায় ত্রিশূল, মাথায় জটাজূট, ঘন দাড়ি-গোঁফ, গলায় রুদ্রাক্ষ, আর চোখ দু'খানা অন্ধকারেও জ্বলছে। তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে দেখে বটেশ্বর একটু কুঁকড়ে গেল। ফের বজ্রকণ্ঠে সাধু বলে উঠল, "তুই! তুই এখানে কী করছিস?"

ভয়ে পেটের ভিতরটা গুড়গুড় করে উঠল বটে, কিন্তু শত হলেও তো বটেশ্বর পায়েসপুরের পয়লা নম্বরের পালোয়ান। তাই সে কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলল, "দেখতেই তো পাচ্ছেন মশাই, বসে হাওয়া খাচ্ছি!"

সাধু অতি বিকট গলায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "হাওয়া খাচ্ছিস? তোর কি হাওয়া খাওয়ার কথা?"

"কেন মশাই, আমি হাওয়া খেলে আপনার অসুবিধে কী? নিজের কাজে যান তো মশাই, মেলা ঝামেলা করবেন না।"

তার তড়পানি দেখে সাধু যেন বিস্ময়ে মূক হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ "তবে রে বেআদব," বলে তার নড়া ধরে এক হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে সপাটে গালে একটা চড় কষিয়ে বলল, "চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা কইছিস যে বড়! কে তোকে ছেড়ে দিয়েছে বল, কোন সাহসে তুই মাঠে-ময়দানে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছিস?"

চড় খেয়ে বটেশ্বরের চোখে সরষেফুল নাচানাচি করছে, মাথার ভিতরে ঝিমঝিম শব্দ। এ তল্লাটে এমন বুকের পাটা কারও নেই যে, তার গায়ে হাত তোলে। তাই একটু সামলে উঠেই "তবে রে," বলে বটেশ্বর সাধুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু একটা নিরেট দেওয়ালেই যেন ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল সে।

সাধু ক্যাঁক করে তার ঘাড়টা ধরে ঠেলতে-ঠেলতে মাঠের উত্তর দিকে নিয়ে যেতে-যেতে বলল, "তোর এখনও অনেক শিক্ষা বাকি আছে দেখছি!"

বটেশ্বর বুঝল, তার এতকালের এত মেহনত, এত কসরত, এত ঘাম ঝরানো সবই বৃথা গিয়েছে। এত ঢেউ খেলানো পেশি, এত ল্যাটিসমাস বাইসেপ, কাফ মাস্‌ল, সিক্সপ্যাক নিয়েও এসব কী হচ্ছে? এ যে বাঘের মুখে নেংটি ইঁদুরের মতো দশা তার! সে চিঁচি করে লোকজন ডাকার চেষ্টা করছিল, কিন্তু পিছন থেকে সাধু হুড়ুম করে তার মাজায় হাঁটু দিয়ে এমন গুঁতো মারল যে, বটেশ্বরের বাক্য হরে গেল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ও মশাই, ও সাধুবাবা, এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমায়? এসব কী হচ্ছে? এর ফল কিন্তু খুব খারাপ হবে!"

সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, নাড়ুবাবু মাঠে তাঁর গোরু খুঁজতে এসেছেন, কিন্তু বটেশ্বর তাঁকে হাত নেড়ে ডাকতেই তিনি সুট করে গোরুর আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। ঘেসুড়ে রামদীনও তার দুর্দশা দেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। প্যালাবাবু শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছিলেন, একেবারে মুখোমুখি দেখা। কোথায় সাধুটার পথ আটকাবি, ধমক চমক চেঁচামেচি করে লোক জোটাবি, তা নয়, একগাল হেসে গদগদ হয়ে বললেন, "সাধুর কাছে মন্তর নিলি বুঝি বটেশ্বর? বাঃ বাঃ, ধর্মকর্ম খুব ভাল জিনিস!" এই বলে চলে গেলেন।

লাঠিধারী নন্দরাম চৌকিদারকে দেখে একটু ভরসা হয়েছিল বটেশ্বরের। কিন্তু উলটে নন্দরাম ভারী ভক্তিভরে হাতজোড় করে "গোর লাগি সাধুবাবা," বলে সাধুকে গদগদ হয়ে পেন্নাম করে পথ ছেড়ে দিল।

পায়েসপুরের উত্তরে প্রতাপগড়ের গহীন জঙ্গল। সেই জঙ্গল নিয়ে বিস্তর রোমহর্ষক গল্পও আছে। রাতে তো দূরের কথা, দিনেদুপুরেও বড় একটা কেউ জঙ্গলে ঢোকে না। সাধু বটেশ্বরকে নিয়ে সেই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘটনাটা চাউর হতে দেরি হল না। সন্ধেবেলাতেই চণ্ডীমণ্ডপে মেলা লোক জড়ো হয়ে গেল।

রাখোহরি কানে কম শোনে। তার ধারণা, বটেশ্বরকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে। খুব চিন্তিত মুখে বলছিল, "কথা হল, বটেশ্বরকে ক'টা বাঘে খাবে? সাতটা বাঘের খোরাক যদি একটা বাঘে খায়, তা হলে কি বড্ড আইঢাই হবে না? কত মাংস বটেশ্বরের?"

নোয়াপাড়ার বজ্রবাহু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল, "ওসব অলক্ষুনে কথা কেন দাদা? বাঘ নয়, বটেশ্বরকে এক সাধু নিয়ে গিয়েছে।"

গদাধর ঘনঘন মাথা নেড়ে বলল, "বাঘে নিলে আর খারাপ কী হত বলো! সাধুর যা বৃত্তান্ত শুনছি তাতে তো মনে হয়, বটেশ্বরকে হয় শবসাধনায় লাগাবে, নয়তো নরবলি দেবে কিংবা কেটেকুটে নরমাংস খাবে। আরে এই সাধুই তো নগেন সর্বাধিকারীর বাড়িতে ক'দিন আগে হামলা করেছিল, ওদের টমি কুকুরটা তাড়া করায় তেমন কিছু করতে পারেনি।"

নাড়ুবাবু ঘটনার সাক্ষী। তিনি রোগা মানুষ। উঠে দাঁড়িয়ে জমায়েত লোকজনের সামনে বললেন, "আহা, আমিই তো ছেলেধরাটার হাত থেকে বটেশ্বরকে উদ্ধার করতে পারতাম। কিন্তু এক হাতে গোরুর দড়িটা ধরা ছিল বলে হয়ে উঠল না। তবে একথা ঠিক যে, সেই বিভীষণ সাধুর হাতে পড়ে বড়ই নাকাল হচ্ছিল বটেশ্বর। ওর ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে না।"

প্যালাবাবু ভারী বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, "তা হলে তোমরা বলতে চাও যে, বটেশ্বরের বৈরাগ্য আসেনি? আমি তো ভেবেছিলুম সংসার-বৈরাগ্য আসায় বটেশ্বর সাধুর হাত ধরে সন্ন্যাসে যাচ্ছে! অপহরণ বলে বুঝতে পারলে কী আর সাধুব্যাটা পারত আমার হাত থেকে পালাতে?"

রামদীন মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "সাধুজি বটেশ্বরবাবুকে পাকড়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আমি শোচলাম কী, বটেশ্বরবাবু দুই মুক্কা মেরে সাধুকে জমি ধরিয়ে দিবেন। আমি দুবলা মানুষ, জিন্দেগিতে কখনও মারপিট করিনি, উসি লিয়ে আমি আঁখে ঘুরিয়ে নিলাম।"

খগেন তপাদার নন্দরামের দিকে চেয়ে বললেন, "তোর হাতে তো লাঠি ছিল, সাধুটাকে ঘা কতক দিতে পারলি না?"

নন্দরাম জিভ কেটে দু'হাত দিয়ে কান ছুঁয়ে নিয়ে বলল, "ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলবেন না। সাধু-মহাত্মাদের গায়ে হাত তুলে কী সাতজন্ম নরকে পচব মশাই? আর খুব তেজালো সাধু মশাই! চোখ দু'খানা ধকধক করে জ্বলছিল, আর কী দশাসই চেহারা!"

বটেশ্বরের বাবা সর্বেশ্বর মুখ কালো করে বসে ছিলেন। ফোঁত করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "এখন মুক্তিপণের অত টাকা আমি পাব কোথায়? আপনারা পাঁচ-দশ টাকা করে কালেকশন না দিলে সাধু যে ছেলেটাকে মেরে ফেলবে!"

খগেন অবাক হয়ে বললেন, "মুক্তিপণ কি চাওয়া হয়েছে?"

সর্বেশ্বর বলল, "এখনও চায়নি বটে, কিন্তু চাইবে। আগে থেকে প্রস্তুত না থাকলেই বিপদ। আমি বড় দেখে একটা ধামা নিয়েই এসেছি। আপনারা উদারহস্তে টাকা ফেলতে শুরু করে দিন। এখন থেকে রোজই বাড়ি-বাড়ি ঘুরে চাঁদা তোলা হবে।"

সর্বেশ্বরের এই ঘোষণা শুনে একজন দু'জন করে লোক কেটে পড়তে লাগল। এবং চণ্ডীমণ্ডপ ফাঁকা হয়ে যেতে সময় লাগল না।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালবেলা কেপুবাবু খুবই সন্তর্পণে রাধাগোবিন্দর বাইরের ঘরে ঢুকে একটু গলাখাঁকারি দিলেন। আত্মজীবনী রচনায় মগ্ন রাধাগোবিন্দ অবশ্য সেই শব্দ শুনতে পেলেন না। কেপুবাবু ফের একটু জোরে গলাখাঁকারি দিয়ে মোলায়েম গলায় ডাকলেন, "রাধাদা!"

রাধাগোবিন্দ মুখ না তুলেই মাথা নেড়ে বললেন, "রাধা নেই, বাজারে গিয়েছে।"

একটু বিস্মিত কেপুবাবু বললেন, "আপনি যে বর্তমানে নেই তা বুঝতে পারছি! কিন্তু বাজারেই কি এখন আপনাকে পাওয়া সম্ভব?"

রাধাগোবিন্দ সম্পূর্ণ মগ্ন অবস্থাতেই বললেন, "অ। তা আছে বোধ হয় কোথাও, ভিতরে দ্যাখোগে।"

কেপুবাবু বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, "কথাটা আপনার জানা দরকার। একটু কষ্ট করে অতীত থেকে যদি বর্তমানের দিকে আসেন, তা হলে ভাল হয়।"

'দারোগার দীর্ঘশ্বাস' লেখা থামিয়ে অগত্যা রাধাগোবিন্দ মুখ ফেরালেন। তারপর চিনতে পেরে বলে উঠলেন, "কেপুবাবু যে! তা কাকে খুঁজছিলেন যেন?"

"আপনাকেই।"

"আমাকে! কেন, আমি কোথাও গিয়েছিলুম নাকি?"

"তা তো বটেই। এখন আর তখনের মধ্যে আপনার নিত্যি যাতায়াত। তা যে কথাটা বলতে আসা। আপনি যে একজন দারোগা ছিলেন, সেটা কি আপনার মনে আছে?"

"থাকবে না মানে? কত গুন্ডা-বদমাশ, চোর-চোট্টা, ডাকাত-ছেলেধরা ঠান্ডা করেছি। রোমহর্ষক সব ঘটনা। বইটা বেরোলেই দেখবেন, কেমন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ে!"

"সে তো বটেই। কিন্তু এত বড় ডাকসাইটে দারোগা হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে কেউ পুঁছছে কি? এই যে সব বিদ্ঘুটে কাণ্ড নাকের ডগায় ঘটে যাচ্ছে, আপনার কি মনে হয় না, গাঁয়ের লোকের আপনার কাছে এসে পরমর্শ নেওয়া উচিত ছিল?"

"বটেই তো! কিন্তু গাঁয়ে হচ্ছেটা কী?"

"কী হচ্ছে না বলুন? পায়েসপুরে বহিরাগত উগ্রবাদী ঢুকে বহাল তবিয়তে বসবাস তো করছেই, সেইসঙ্গে ফুটবল খেলছে, মারদাঙ্গা করে বেড়াচ্ছে। সাধুর ছদ্মবেশে ডাকাত ঢুকে নগেনবাবুকে হুমকি দিয়ে গিয়েছে, আর গতকাল বটেশ্বরকে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়েছে।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রাধাগোবিন্দ দাঁড়িয়ে পড়লেন, "ডাকাতি! মুক্তিপণ! ওরে শিগ্গির পিস্তলসমেত আমার ক্রস বেল্টটা নিয়ে আয়, আর ইউনিফর্মটাও দে।"

"আহা, অত তাড়া কিসের রাধাদা? স্থির হয়ে বসুন। এখন আপনি বর্তমানে আছেন, সেটা কি ভুলে গেলেন?"

রাধাগোবিন্দ একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, "তাই তো! হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন? বটেশ্বর? তা কত মুক্তিপণ চেয়েছে?"

"এখনও চায়নি। তবে বটেশ্বরের বাবা করিৎকর্মা লোক। আগে থেকেই কালেকশন তুলতে শুরু করেছে। আপনার বাড়িতেও এল বলে।"

"এ যে ঘোর অরাজকতা! এর তো বিহিত করা দরকার?"

"তা তো বটেই। আর সেই জন্যই তো আপনার কাছে আসা! দেশমাতৃকার তো এখন আপনার মতো সুসন্তানকেই দরকার। ঘাপটি মেরে গা ঢাকা দিয়ে থাকেন বলে কেউ টের পায় না যে, আপনিও এই পায়েসপুরের গৌরব। এই যে হারাধন পায়েসপুরের এত সুখ্যাতি করে বেড়ায়, সে কি ভুলেও একবার নাম উচ্চারণ করে? অথচ আপনি কার চেয়ে কম বলুন তো? এই যে মদনপাগলা আপনাকে জানালা দিয়ে বক দেখায়, এই যে খগেন তপাদার সেদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসে বলছিল, 'ওহে রাধাগোবিন্দ যেমন দারোগার দীর্ঘশ্বাস নামে বই লিখছে, তেমনই কালুচোরও নাকি পালটা আর-একখানা পুঁথি লিখে ফেলেছে, নাম দিয়েছে 'দারোগার নাভিশ্বাস'।' তা লিখবে না-ই বা কেন? কালুকে ধরতে গিয়ে নাকি রাধাগোবিন্দ একবার কুকুরের তাড়া খেয়ে পুকুরে পড়েছিল, আর-একবার নয়নপুরের জলায় কাদায় পড়ে চার ঘণ্টা আটকে থাকে। ভুল করে নসিবপুরের যাত্রার দলের প্রম্পটারকে কালু মনে করে পাকড়াও করায় পাবলিকের কাছে হেভি ঠ্যাঙানি খায়। শেষে লোকে তার নামই দিয়েছিল 'গাধাগোবিন্দ'। শুনুন কথা! আপনি চোখ কান বুজে থাকেন বলে এসব কথা আপনার কানে যায় না, আর লোকেও আশকারা পেয়ে যায়। তাই বলছি, একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বুক ফুলিয়ে গাঁয়ে কয়েকটা চক্কর দিয়ে আসুন তো!"

রাধাগোবিন্দ হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, "বটে! আস্পর্দা তো বড় কম নয়!"

"আস্পর্দার কথা আরও শুনবেন? এই যে ভূপেনদারোগা এতবার করে গাঁয়ে রোঁদ দিতে আসে, একটিবারও কি এসে আপনাকে সেলাম জানিয়ে যায়? সে কি জানে না যে, আপনি কত বড় একজন জাঁদরেল দারোগা ছিলেন? লোকে তো শিখতেও আসে, না কি! তারপর ধরুন, এই যে নিধে হাজাম সেদিন আপনাকে খেউরি করে পয়সা নিয়ে গেল, সেটা কি তার উচিত হয়েছে? কে না জানে, পুলিশ-দারোগাদের সেবা করলে পুণ্যি হয়। খেউরির পয়সাটা সে তো ভেটই দিয়ে যেতে পারত! ওটুকু তো আপনার ন্যায্য পাওনার মধ্যেই পড়ে! ইশকুলের যে পুরস্কার বিতরণী সভা হয়ে গেল, তাতে গাঁয়ের সব ক'জন মান্যগণ্য লোককে ডাকা হল, শুধু আপনি বাদে। আমি নবীনমাস্টারকে যখন বললাম, 'কাজটা কি ঠিক হল হে নবীন? রাধাগোবিন্দবাবুও তো একজন কেষ্টবিষ্টু লোক!' শুনে নবীন কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে চোখ কুঁচকে বলল, 'কে, কার কথা বলছেন? রাধাগোবিন্দটা আবার কে?' শুনুন কথা! সেই যে আপনার কনস্টেবল নিকুঞ্জ বৈরাগী, তার শ্বশুরবাড়ি তো এই পায়েসপুরেই। গত জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ি এসেছিল, আমি গিয়ে বললাম, 'ওহে নিকুঞ্জ, একবারটি তোমার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবে না?' নিকুঞ্জ কাঁঠাল খাচ্ছিল, খেতে-খেতেই হিহি হেসে বলল, 'রাধাবাবুর কথা আর কবেন না কর্তা! ওঁর সামনে গেলে আমি হেসেই মরে যাব!' আমি বেআদবটাকে বললাম, 'কেন? রাধাদাকে দেখে তো মোটেই হাসি পায় না?' তখন বলল কী জানেন? বলল, 'রাধাবাবু এমনই নিষ্কর্মা দারোগা ছিলেন যে, তাঁর আমলেই থানায় ডাকাতি হয়েছিল। আর রাধাবাবু ডাকাতের ভয়ে ইউনিফর্ম ছেড়ে আন্ডারওয়্যার পরে লকআপে কয়েদি সেজে ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন। তাই দেখে ডাকাতদের সে কী হাসি! লুটপাট করে যাওয়ার আগে তারা রাধাবাবুকে সাত হাত নাকে খত দিইয়েছিল। না মশাই, রাধাবাবুকে দেখলেই ফের হেসেটেসে ফেলব।' "

রাধাগোবিন্দ বিস্ফারিত লোচনে কিছুক্ষণ কেপুবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর সমস্ত উত্তেজনা আর রাগ অন্তর্হিত হল। চোখ দু'টো আস্তে-আস্তে ছোট হয়ে এল এবং গোলাকার মুখটা হঠাৎ যেন চৌকোমতো হয়ে গেল। কেপুবাবু খুব তীক্ষ্ণ চোখে রাধাগোবিন্দবাবুর পরিবর্তনটা দেখছিলেন। এমনিতেই খুব লম্বা-চওড়া চেহারার রাধাগোবিন্দর শরীরটাও যেন হঠাৎ টনটনে শক্তপোক্ত হয়ে উঠল। নিকুঞ্জ বৈরাগী জনান্তিকে কেপুবাবুকে এই লক্ষণটার কথাই বলেছিল বটে! বলেছিল, 'রাধাবাবু এমনিতে শান্তশিষ্ট হলে কী হয়, যখন এই লক্ষণগুলো দেখবেন, তখনই বুঝবেন যে, ওঁর ভিতরে একটা খ্যাপা ষাঁড় জেগে উঠেছে। তখন স্বয়ং যমও ওঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না। বঙ্কুডাকাতকে এই ভাবেই তো কাত করেছিলেন উনি। ঠিকমতো খেপিয়ে তুললে ওরকম ডাকাবুকো লোক ভূভারতে পাবেন না।' "

কেপুবাবুর দিকে স্থির চোখে চেয়ে হিমশীতল গলায় রাধাগোবিন্দ প্রশ্ন করলেন, "নিকুঞ্জ বৈরাগী কোথায়?"

কেপুবাবু তটস্থ হয়ে বললেন, "আহা, সে কি আর হাতের নাগালে বসে আছে দাদা? কোন থানায় ডিউটি দিচ্ছে কে জানে!"

"খগেন তপাদার কোথায়?"

কেপুবাবু মাথা নাড়া দিয়ে বললেন, "সেও গাঁয়ে নেই। তবে তাকেও সময়মতো ঠিকই পাওয়া যাবে।"

"ভূপেনদারোগা কোথায়?"

"তার কি আর নাওয়া-খাওয়ার সময় আছে দাদা? পাঁচটা গ্রাম রোঁদ দিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। চুরি-ডাকাতি যা বেড়েছে, কহতব্য নয়!"

"নবীনমাস্টার কোথায়?"

"এখন ইশকুলে কিসের যেন ছুটি চলছে, তাই নবীন বুঝি গত পরশুই মামাবাড়ি গেল!"

"মদনপাগলা কোথায়?"

"সে পাগলছাগল মানুষ, কোন আলায়বালায় ঘুরছে কে জানে? আমি বলি কি, সব ক'টাকে একসঙ্গে টিট করতে গেলে একটু ভজঘট্ট লেগে যাবে। আপনি বিচক্ষণ মানুষ, নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রায়োরিটি বুঝে একটা-একটা করে কাজ সেরে ফেলতে হয়। সবক'টা একসঙ্গে নয়। তাই বলছিলাম, এখন সবচেয়ে জরুরি হল, সেই ছেলেধরা সাধুটার হাত থেকে আমাদের বটেশ্বরকে উদ্ধার করা।"

"সাধু কোথায়?"

"প্রতাপগড়ের জঙ্গলে। সে বড় ভয়ংকর জায়গা। দিনেদুপুরে লোক ঢুকতে সাহস পায় না।"

"প্রতাপগড়ের জঙ্গল কোথায়?"

"উত্তর দিকে। তা বলে হুট করে রওনা হয়ে পড়বেন না। সাধু হোক, ছেলেধরা হোক, সে সোজা পাত্র নয়। আমাদের পালোয়ান বটেশ্বরকে নেংটি ইঁদুরের মতো তুলে নিয়ে গিয়েছে। সুতরাং তার মোকাবিলার জন্য প্রিপারেশন দরকার। সঙ্গে একটা অস্ত্রটস্ত্র থাকলে ভাল হয়। অন্তত একটা লাঠি।"

রাধাগোবিন্দ ভারী অবাক হয়ে বললেন, "অস্ত্র! অস্ত্রের কী দরকার? এই দু'টো হাতই যথেষ্ট!"

এই বলে রাধাগোবিন্দ দড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ৪ ॥

গদাইয়ের হল কষ্টের কপাল। তা কেষ্ট পেতে গেলে কষ্ট তো কপালে আছেই। কিন্তু গদাই কেষ্ট চায় না, এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস, কেষ্টও তাকে চায় না। তাই গদাইয়ের হল কেষ্টহীন কষ্টের জীবন। যে কাজটা মানুষের এক লহমায় হয়, গদাইয়ের হতে লাগে সাত দিন। এই যে কষ্ট করে-করে আদাড়েপাদাড়ে ঘুরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে সাপ ধরে বিষ আদায় করে নেয়, তার বদলে পায় ক'টাই বা পয়সা? অথচ সে শুনেছে, দশ-বিশ গ্রাম সাপের বিষের নাকি লাখো টাকা দাম। কিন্তু সীতেশবাবুকে কে বোঝাবে সে কথা? কখনও পঞ্চাশ, কখনও একশো টাকা ঠেকিয়ে বিদেয় করে দেন। তারপর ধনেশ পাখির তেল, মৃগনাভি, বাঘের দাঁত, চমরি গোরুর লেজ, পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণাবর্ত শাঁখ, এসবেরও কি আর বাজার আছে? শুনলে লোকে নাক সিঁটকোয়। কাউকে গছাতে পারলেও নগদ দাম পাওয়া যায় না, সব বাকির খদ্দের। অনেকে আবার ভেজাল জিনিস মনে করে দুর-দুর করে তাড়িয়েও দেয়। এসব জিনিসের সমঝদার নেই মোটে।

দিনকাল যখন খুবই খারাপ যাচ্ছে, তখনই ঘটনা। সে প্রতাপগড়ের জঙ্গলে বিরল গাছগাছড়ার খোঁজে সারাদিন ঘুরে-ঘুরে হয়রান হয়ে ভাঙা কেল্লার লাগোয়া পুরনো শিবমন্দিরের চাতালে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গরিবের তো ভয়ডর, শীত-গ্রীষ্ম, আরাম-আয়েসের ব্যাপার নেই। ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে!

বুকে একটা খোঁচা খেয়ে ঘুম ভাঙল শেষ রাত্তিরে। চোখ চেয়ে দ্যাখে, সামনে এক বিভীষণ সাধু হাতে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্য হাতে এক প্রকাণ্ড ত্রিশূল তার বুকে চেপে ধরে আছে। গদাইয়ের আত্মারাম তখন বুকের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে। তবে বিপদআপদ নিয়েই বাস। তাই তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বলল, "পেন্নাম হই মহারাজ।"

"তুই কে?"

"আজ্ঞে, আপনার শ্রীচরণের দাস বলেই মনে করুন। লোক তেমন খারাপ নই, তবে বড় অনটন যাচ্ছে। মন্তর নিলে কি কিছু সুবিধে হবে বাবা?"

ভেবেছিল কুপিত সাধু বোধ হয় ত্রিশূলটা তার বুকে ঢুকিয়েই দেবে। অতটা অবশ্য করল না। ত্রিশূলটা সরিয়ে নিয়ে বলল, "তোর কিসের অনটন?"

গদাই তড়াক করে উঠে সাধুর পায়ে সাষ্টাঙ্গে একটা প্রণাম সেরে নিয়ে বলল, "আজ্ঞে, কিসের অনটন নয় বলুন বাবা! চাল, ডাল, নুন, তেল, কাপড়চোপড়, গাড়ু-গামছা, ঘরদোর, যার নাম করবেন তারই অনটন। সাপখোপ ধরে আর জড়িবুটি বেচে মোটেই চলছে না বাবা!"

সাধু জুলজুল করে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বলল, "তোর হাতে

ওটা কিসের বালা রে?"

"আজ্ঞে, এটা লোহার বালা। এক ফকির দিয়েছিল।"

"দে ব্যাটা, ওটা খুলে দে।"

সাধু তার ঝোলা থেকে একখানা পাথর বের করে বালায় ঠেকাতেই সেটায় যেন দপ করে আগুন ধরে গেল। প্রথমটায় আগুন বলেই ভ্রম হয়েছিল বটে গদাইয়ের। ভাল করে চোখ কচলে দেখল, আগুনটাগুন নয়, লোহার বালা এক লম্ফে ডবল প্রমোশন পেয়ে সোনা হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ বাক্যি ছিল না মুখে, চোখের পাতাও পড়েনি তার।

সাধু তার হাতে বালাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "যা ব্যাটা, এটা বেচে যা টাকা পাবি তাতে তোর অনটন খানিক ঘুচবে।"

গদাই ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফের কাটা কলাগাছের মতো পড়ে সাধুর পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে বলল, "দিলেনই যদি বাবা, তবে মুঠিটা আরও একটু খুলুন। কেল্লার লোহার ফটকটা পড়ে আছে। ওটাতেও একটু ঠেকিয়ে দিন, তা হলে দুঃখু একেবারে ঘুচে যায়। দেড়-দু' মন সোনা পেলে বাকি জীবনটা হেসেখেলে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।"

সাধু দু' পা পিছিয়ে গিয়ে হুংকার দিয়ে বলল, "বেশি লোভ করলে শূলে গেঁথে প্রাণবায়ু বের করে দেব হারামজাদা! কিছু দিলেই দেখছি তোদের লোভ বেড়ে যায়। দুর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে। বেশি লোভ করলে বিপরীত পাথর ঠেকিয়ে দেব, সোনা ফের লোহা হয়ে যাবে।"

গদাই ভয় পেয়ে উঠে বসল। চোখের জল মুছে একগাল হেসে বলল, "মারুন, কাটুন আর যাই করুন, আমি আপনার সঙ্গ ছাড়ছি না!"

তা সেই থেকে গদাই সাধুর সঙ্গে-সঙ্গে আছে। পুরনো শিবমন্দিরের ভিতরটা যেমন ভাঙাচোরা, তেমনই নোংরা। চামচিকে, বাদুড়, সাপ আর বিছের আস্তানা। গদাই সেটাই যথাসাধ্য সাফসুতরো করে দিল। সাধুর ঠেক। ধুনি জ্বেলে সাধু সাধন-ভজন করে আর পাশেই গদগদ হয়ে গদাই বসে থাকে। লোকটা যে খুব উচ্চ কোটির সাধু, তাতে কোনও সন্দেহ নেই গদাইয়ের। কিন্তু বয়সটা বড্ড বেশিই ঠেকছে। গায়ের চামড়া এমন ঝুলে পড়েছে যে, সেই বাড়তি চামড়ায় আর-একটা লোককে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। জটাজুট এতই বিশাল যে, পাকালে জাহাজ বাঁধার দড়ি হয়ে যায়। সেই সঙ্গে বুড়ো বয়সের যা দোষ, সেই ভীমরতিও একটু ধরেছে বলে গদাইয়ের ধারণা। মাঝে-মাঝেই সাধু জিজ্ঞেস করে, "এটা কোন জায়গা রে?"

"আজ্ঞে, এ হল প্রতাপগড়ের জঙ্গল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছিলি বটে! পঁচাত্তর বছর আগে এরই কাছেপিঠে কোন গাঁয়ে যেন এসেছিলাম, মনে পড়ছে না। আশপাশের গাঁগুলোর নাম জানিস?"

"তা আর জানব না বাবা! এই তো উত্তরে প্রতাপগড়, পুবে হল গে হবিবপুর, পশ্চিমে পটলডাঙা আর দক্ষিণে পায়েসপুর।"

"পায়েসপুর! হ্যাঁ হ্যাঁ, পায়েসপুরই তো সেই গাঁয়ের নাম! সেখানে কী এক সর্বাধিকারী আছে না?"

"আজ্ঞে, আছে বইকী। নগেন সর্বাধিকারী। হাড়কঞ্জুস লোক। গতবার আমার কাছ থেকে বাতের তেল কিনে আজ অবধি দাম দেননি।"

"না না, নগেন নয়। অন্য নাম।"

"নগেনের বাবা ছিলেন বিশ্বেশ্বর। পঁচাত্তর বছর আগের কথা যখন বলছেন তখন উনিই হবেন।"

সাধুর চোখ ধক করে উঠল। বলল, "সে-ই। তাকেই আমি সেই পিদিম দিয়ে গিয়েছিলাম।"

"কিসের পিদিম বাবা?"

"সে খুব সাঙ্ঘাতিক পিদিম। যে ব্যবহার না জানে তার সর্বনাশ হয়ে যায়। আমি সেই পিদিম ফেরত নিতে এসেছি।"

সাধুর পদসেবা করতে-করতে গদাই জিজ্ঞেস করল, "তা বাবা, আপনার বয়স এখন কত হল? শতখানেক হবে না?"

"দুর! শতখানেক কী রে? ঠিক হিসেব নেই বটে, তবে পাঁচশো ছাড়িয়েছি।"

"ওরে বাবা!"

খুব মন দিয়েই সাধুর পদসেবা করে গদাই। দেখেশুনে তার মনে হচ্ছে পাঁচশো বছর বয়সি সাধু আর বেশি দিন নেই। ভীমরতিও একটু ধরেছে, ভুলভাল হচ্ছে। এসব লক্ষণ সে চেনে। সাধুর ভালমন্দ কিছু হয়ে গেলে সাধুর জিনিসপত্র তারই হাতে এসে যাবে। তখন আর তাকে পায় কে?

একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গদাই দেখল, সাধুবাবা চিতপাত হয়ে অঘোরে ঘুমে। নাকও ডাকছে। বড্ড ইচ্ছে হল, সেই পাথরটা বের করে পাথরের কেরদানিটা একটু নিজেই পরখ করে দ্যাখে। না, সে পাথরটা চুরিটুরি করবে না। ততটা আহাম্মক সে নয়। এই একটু দেখবে আরকি। সোনাদানা তো আর বিশেষ দেখেনি। এই মনে করে সে বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে গিয়ে সন্তর্পণে ঝোলার মুখটা ফাঁক করে হাতটা ঢোকাতে যাবে, ঠিক সেই সময় ঘুমন্ত সাধুর মুখ থেকে একটা বজ্রনির্ঘোষ বেরিয়ে এল, "উঁহু!"

'উঁহু' শব্দটা যে এত উঁচু পরদায় বাঁধা যায় তা তার ধারণাই ছিল না। আঁতকে উঠে সভয়ে ফের সাধুর পায়ের দিকটায় গিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল সে।

সকালে সাধু জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, "ঝোলায় হাত দিয়েছিলি কেন?"

তাড়াতাড়ি সাধুর পা চেপে ধরে গদাই বলল, "আর হবে না। আপনি যে চোখ বুজেও দেখতে পান, সেটা খেয়াল ছিল না বাবা! পাপী মন তো!"

কিন্তু কৌতূহল এক সাঙ্ঘাতিক জিনিস। পরশপাথরের গল্প শোনা আছে বটে, কিন্তু চাক্ষুষ করেনি। একটু নেড়েঘেঁটে দেখার ইচ্ছেটা বড় আঁকুপাঁকু করছে মনের মধ্যে। সোনার বালাটা সে প্রতাপগড়ের বিধু স্যাকরাকে এক ফাঁকে দেখিয়ে এনেছে। কষ্টিপাথরে ভাল করে যাচাই করে স্যাকরা বলেছে, 'জিনিসটা তো খাঁটিই দেখছি! তা কোথায় পেলি? চুরিটুরি করিসনি তো বাপু?'

চুরি যে করেনি সেটা বলে লাভ নেই। গরিবের কথা কে আর বিশ্বাস করে? তবে গরিব নাম ঘোচাতে পারলে সব ব্যাটা কথার দাম দেবে।

সাধুর ভয়ে ঝোলাটার দিকে কয়েকদিন আর নজর দেয়নি গদাই। তা একদিন সাধু ঝোলা রেখে চান করতে মন্দিরের পিছনে পুকুরে গিয়েছে, তখন অনেক চেষ্টাতেও নিজেকে সামলাতে পারল না গদাই। ঝটিতি গিয়ে ঝোলার মুখটা ফাঁক করেছে কি করেনি, অমনই ঝোলার ভিতর থেকে সেই বজ্রনির্ঘোষটা বেরিয়ে এল, "উঁহু!"

আঁতকে উঠে লম্ফ দিয়ে সরে এল গদাই। ই কী রে বাবা! ঝোলার ভিতর থেকে কে কথা কয়? ভূত নাকি রে ভাই?

সাধু স্নান সেরে এসে তার দিকে রক্তচক্ষুতে চেয়ে বলল, "ফের ঝোলায় হাত দিয়েছিলি নিমকহারাম?"

"তখন কি জানতাম যে আপনি না থাকলেও আপনার ওই বিটকেল 'উঁহু'টাকে পাহারায় রেখে যাবেন! ঘাট হয়েছে বাবা, আর নয়!"

"মনে থাকে যেন!"

একদিন রাতে সাধুর পা দাবাতে-দাবাতে গদাই জিজ্ঞেস করল, "তা বাবা, পায়েসপুরে ফিরে আসতে আপনার পঁচাত্তর বছর লাগল কেন? পঁচাত্তর বছর যে বড্ড লম্বা সময়।"

সাধু গম্ভীর গলায় বলল, "সে তোদের কাছে। আমার তো শুধু পায়েসপুর নিয়ে কাজকারবার নয়। সারা দুনিয়াময় চক্কর কাটতে হয়। সাধন-ভজন আছে। তীর্থদর্শন আছে। পরিক্রমা আছে। ওসব তুই বুঝবি না। তবে এবার সব গুটিয়ে ফেলতে হবে। আয়ু আর বেশি দিন নয়। জিনিসপত্র সবই প্রায় উদ্ধার করে ফেলেছি। পিদিমখানা উদ্ধার হলেই কাজ একরকম শেষ।"

"তা সে পিদিমখানায় কী আছে বাবা?"

"ওঃ, সে বড় সাংঘাতিক জিনিস। অপাত্রে পড়লে দুনিয়া ছারখার হয়ে যাবে।"

"তা সেই সাংঘাতিক জিনিসটা হাতছাড়া করলেন কেন ঠাকুর?"

"সব জিনিসেরই ভালও আছে, মন্দও আছে। পিদিমখানা যাকে দিয়ে গিয়েছিলুম, সে দুঃখী মানুষ হলেও ভাল লোক। কিন্তু তার অবর্তমানে বেওয়ারিশ জিনিসটা কার হাতে পড়বে তার ঠিক কী?"

জিনিস ফিরি করে একদিন দিনান্তে আস্তানায় ফিরে মশালের আলোয় গদাই দেখতে পেল, একটা বেশ পেল্লায় চেহারার ছোকরাকে লতাপাতা দিয়ে চাতালে ফেলে রেখে সাধু গম্ভীর মুখে বসে সিদ্ধি গুলছে। মশালের আবছা আলোতেও ছোকরাকে চেনা-চেনা ঠেকল গদাইয়ের।

সে অবাক হয়ে বলল, "এ কাকে ধরে এনেছেন বাবা?"

সাধু থমথমে মুখে বলল, "এটাই সেই দানো। পিদিমের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকার কথা। কোন অপাত্রের হাতে পড়ে ছাড়া পেয়ে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দেখতে পেয়ে ধরে এনেছি। ওর অসাধ্য তো কিছু নেই। তাই লতাপাতা দিয়ে বেঁধে রেখেছি। গভীর রাতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মন্তর দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। ঘুমোক ব্যাটা কয়েক হাজার বছর।"

"সেটা কি আলাদিনের সেই পিদিম নাকি বাবা? উরেব্বাস রে? সেই পিদিম যে পাবে সে তো রাজা!"

সিদ্ধি ঘুঁটতে-ঘুঁটতে সাধু গম্ভীর হয়ে বলল, "পাপীরা তাই ভাবে বটে! সুখ-সম্ভোগের জন্য হেঁদিয়ে মরছিস মায়াবদ্ধ জীব। পরমার্থ খুঁজলি না!"

"যে আজ্ঞে, সেও বড় জব্বর জিনিস। তবে কিনা আগে একটু সুখসম্ভোগ করে নিলে পরমার্থটা জমে ভাল। সোয়াদটা বেশি পাওয়া যায়। এই যেমন নিম-বেগুন বা উচ্ছে হলে পরে পঞ্চব্যঞ্জনের সোয়াদটা বেশ খোলে তো বাবা? দত্যিটাকে যদি ঘুম পাড়িয়ে রাখেন তা হলে পিদিমটা যে ফেকলু হয়ে যাবে?"

"তা তো বটেই!"

"সেটা কি ভাল হবে বাবা? বরং দত্যিটাকে একটু ছেড়ে দিন, ঘুমনোর আগে কয়েকটা কাজ করিয়ে নিই।"

"কী কাজ?"

"কুপিত হবেন না বাবা, বেশি কিছু নয়। এই গা-হাত-পা একটু টিপে দিল, মাথা মালিশ করল, ছোটমতো একটা বাড়ি করে দিল, একটু চাল-ডাল-নুন-তেল আর কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করে নিয়ে এল, দু'-পাঁচখানা মোহর..."

সাধু হুংকার দিয়ে বলল, "পাপিষ্ঠ, নরাধম, ইষ্ট নষ্ট করতে চাস রে আহাম্মক? খাল কেটে কুমির আনবি বেল্লিক? মায়ালতায় বেঁধে রেখেছি বলে, নইলে এই রাক্ষস এতক্ষণে চারদিক লন্ডভন্ড করে দিত, তা জানিস?"

গদাই ভয় খেয়ে বলল, "ওরে বাপ রে! তা হলে বাঁধন খুলে দরকার নেই বাবা! যেমন বাঁধা আছে তেমনই বরং থাক। কিন্তু প্রভু, দানোটা অনেকক্ষণ ধরে চিঁচি করে কী যেন বলার চেষ্টা করছে, ভাল বোঝা যাচ্ছে না।"

ঘটি তুলে খানিক সিদ্ধি ঢকঢক করে খেয়ে সাধু একটা উদ্গার তুলে রক্তচক্ষুতে চেয়ে বলল, "বলছে নাকি?"

"বলছে বাবা।"

সাধু মাথা নেড়ে বলল, "কানে আজকাল ভাল শুনতে পাই না। ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা ক্রমে কমে আসছে। এবার কাজকারবার সব গুটিয়ে ফেলতে হবে রে!"

"সেই কথাই ভাল বাবা। পাথরটাথর, পিদিমটিদিম যা আছে তা ভক্তদের বিলি করে দিয়ে আপনি বরং নিশ্চিন্তে শেষ জীবনটা সাধন-ভজন নিয়ে থাকুন। আমি বরং এদিকটা সামাল দেব।"

"কোন দিকটা?"

"এই টাকাপয়সা, সোনাদানা, পাপতাপ এই সব আরকি।"

"তোর চোখে লোভ জ্বলজ্বল করছে। সেবার ঘুঘুডাঙার একটা দুঃখী লোককে দেখে বড় দয়া হয়েছিল। তাকে একখানা অক্ষয় থালা দিয়ে বলেছিলুম, 'বাপু, এই থালা সামনে রেখে যা খেতে চাইবে তাই পেয়ে যাবে। কিন্তু রয়েসয়ে খেও।' তা ব্যাটা এমন খাওয়া খেল যে, দম নিতে পারে না। শেষে ওই দম আটকেই প্রাণপাখি বেরিয়ে গেল। ভেবে দেখিস, তুই কিছু খারাপ নেই। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে এই যে পাঁচটা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস, কষ্টের রোজগারে দু'টো খাচ্ছিস, এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? ফাঁকতালে ভোগ করার ফিকির যদি খুঁজিস তবে টসকে যাবি!"

মাথা চুলকে গদাই বলল, "আজ্ঞে, ভাল-ভাল কথাগুলো যখন শুনি বাবা, তখন পাপী মনটার জন্য ভারী লজ্জা হয়। কিন্তু মাঝে-মাঝেই লোভটাও বড্ড ফোঁস করে ওঠে। এই যে কথাগুলো শুনলুম, ইচ্ছে হচ্ছে এখন থেকে ব্যোমভোলা ভাল লোক হয়ে যাই। মনটার মধ্যে বেশ একটা আঁকুপাঁকু হচ্ছে কিন্তু! যেন কাদায় পড়া মোষ কাদা ঠেলে উঠে আসতে চাইছে। তা আপনি যদি টেনে তোলেন তা হলে পাপ-পঙ্ক ছেড়ে পাপী মন একদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়বে'খন।"

ভীমরতি আর কাকে বলে? পরদিন আলায়বালায় ঘুরে গদাই দিনান্তে আস্তানায় ফিরে দ্যাখে, সাধুজি যথারীতি সিদ্ধি ঘুঁটতে লেগেছে। কিন্তু চাতালের উপর আজ আগের দানোটার পাশে আরও একটা লোক পড়ে আছে। এটারও হাত-পা সব লতাপাতায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

গদাই অবাক হয়ে বলল, "উটি আবার কে বাবা?"

সাধু গম্ভীর হয়ে বলল, "এটাও দানো!"

গদাই ভারী ভাবিত হয়ে বলল, "কোথাও গোলমাল হচ্ছে না তো বাবা? একটা পিদিমের মধ্যে কি দু'-দু'টো দত্যি সেঁধিয়ে ছিল? কিন্তু তেমনটা তো শুনেছি বলে মনে হয় না!"

সাধুও একটু দোনামোনা করে বলল, "সেটাও একটা কথা। পিদিমে একটা দৈত্যই ছিল বটে!"

গদাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "নাঃ, আপনাকে এবার ভীমরতিতেই ধরেছে দেখছি বাবা! তা ইটিকে পেলেন কোথায়?"

সাধু গলায় সিদ্ধি ঢেলে বিরাট দ্গা তুলে বলল, "দুপুরের দিকে একটু গড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখি, দানোটা গাছপালা ভেঙে পাগলা হাতির মতো ধেয়ে এসে আমার চুল-দাড়ি ধরে টানাটানি। কিল-ঘুসোও দিচ্ছিল। মনে হল, এটাই আসল দানো! পিদিমের মালিক হয়তো আমাকে টিট করতে পাঠিয়েছে। কিন্তু আমাকে টিট করা কি সোজা! ওই দ্যাখ, মায়ালতায় বেঁধে ফেলে রেখেছি। কিন্তু মুশকিল কী জানিস, কোনটা আসল দানো তা বুঝে উঠতে পারছি না। বড্ড বুড়ো হয়ে গিয়েছি তো! আজকাল একটুআধটু ভুলভাল হয়।"

"কিন্তু বাবা, এদের তো মানুষেরই আকার দেখছি। একটু লম্বাই চওড়াই চেহারা বই তো নয়! ধরুন যদি দানো না হয়ে মানুষই হয়, তা হলে যে এভাবে ফেলে রাখলে খিদে-তেষ্টায় মরে যাবে। তখন যে মহাপাতক!"

সাধু ঘনঘন মাথা নেড়ে বলল, "সে ভয় নেই। বিশল্যকরণীর সঙ্গে সঞ্জীবনী আরক আর সিদ্ধি ঘুঁটে খাইয়ে দিয়েছি। মরার উপায় নেই। কিন্তু পিদিম উদ্ধার না হলে দানো নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠবে। তুই কালই গাঁয়ে গিয়ে যত লম্বা-চওড়া লোক আছে সব ক'টাকে ভাল করে চিনে আসিস তো!"

গদাই সভয়ে বলল, "মহারাজ, এই পায়েসপুর গাঁয়ে লম্বা-চওড়া লোক যে মেলা। সব ক'টাকে আনলে যে গাঁয়ে হুলস্থুল পড়ে যাবে?"

সাধু চিন্তিত মুখে বলল, "তা বটে। কিন্তু পিদিমটা উদ্ধার না হলে যে এ ছাড়া উপায় নেই? একটা পরিবার নির্বংশ হবে। কোন বদমাশের হাতে পড়ে পিদিম কী কাণ্ড ঘটাবে তা কে জানে?"

"তা আপনি তো ত্রিকালদর্শী, এত সাধন-ভজন করেছেন, ধ্যানের চোখে পিদিমটার হদিশ দিতে পারেন না?"

সাধু দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, "ঊর্ধ্বনেত্র আর সুরত-চড়াই হওয়ার পর থেকে আর হঠযোগের ক্ষমতা থাকে না। আমি তো আর
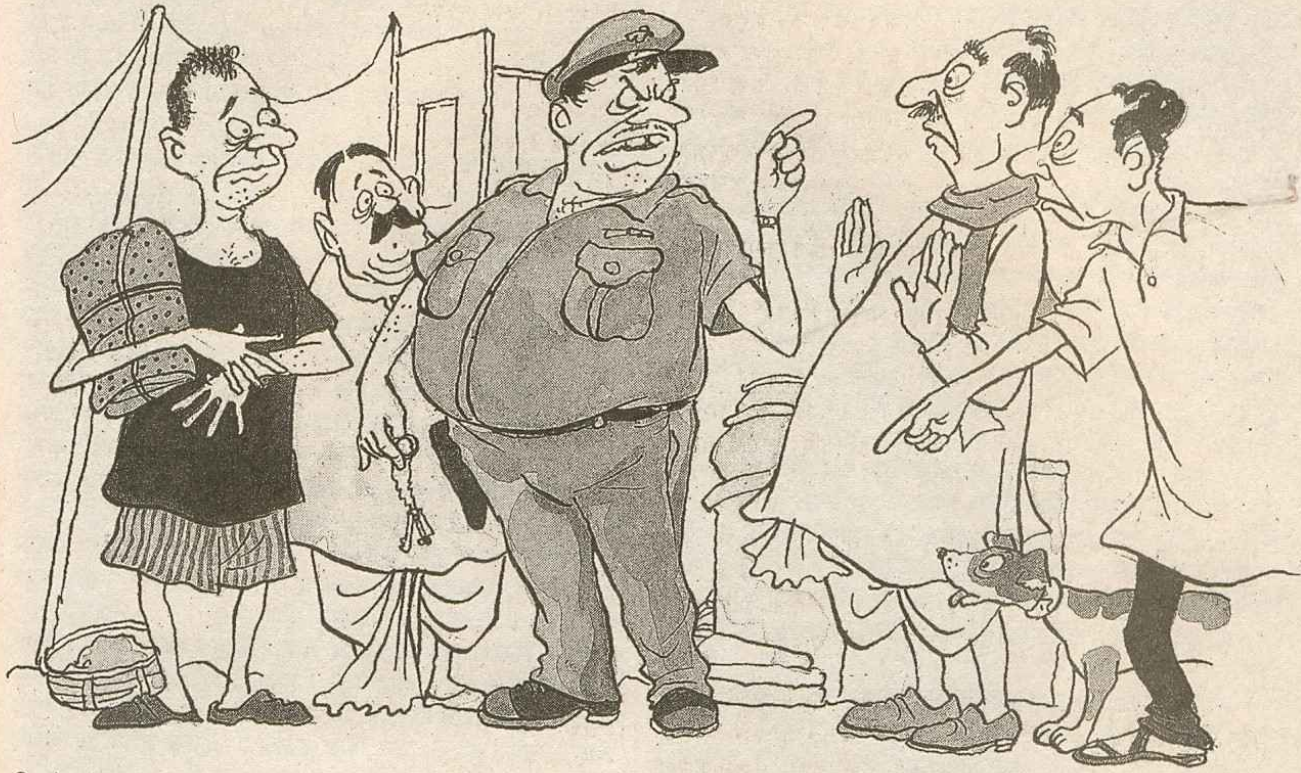
সিদ্ধাই নই, আমার ধ্যানে ওসব ছোটখাটো জিনিস আসে না। তবে পিদিম যে পায়েসপুরেই আছে তা টের পাচ্ছি।"

"হুকুম দেন তো, আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদে আমি একটু সুলুকসন্ধান করে দেখি।"

"তোর চোখে এখনও লোভ চকচক করছে যে?"

গদাই হাত জোড় করে বলল, "তা পাপীতাপী মানুষ বাবা, লোভলালসা নিয়েই তো বেঁচে থাকা। তবে লোভ থাকে থাক, সঙ্গে তো আপনার 'উঁহু'-ও আছে বাবা!"

॥ ৫ ॥

একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সরযূদেবী দেখলেন, তাঁর গলায় সাত ভরি ওজনের মটরদানা হারটা নেই। নেই তো নেই-ই। সারাবাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও সেটা পাওয়া গেল না। সরযূদেবীর তো মাথায় হাত। ঠিকেকাজের লোক সাবি কাজ করতে এসে হঠাৎ হাউমাউ করে বলে উঠল, "ও মা! তোমার হাতের বালাজোড়া কোথায়? সেও কি চোরের বাপের শ্রাদ্ধে গেল?"

সরযূদেবী চমকে উঠে অবাক হয়ে খেয়াল করলেন, সত্যিই তো? বালাজোড়াও তো নেই! তিনি কুঁকড়ে কেঁদে উঠে বললেন, "ওরে, দানুকে শিগ্‌গির ডাক। দানুই তো রাতে পাহারা দেয়!"

কিন্তু দানুকে কোথাও পাওয়া গেল না। নীচের বারান্দায় তার চটের বিছানা একপাশে পরিপাটি গুছিয়ে রাখা। সে কোথাও নেই। নেই তো নেই-ই। একেবারে ভোঁ ভাঁ।

সুতরাং দুইয়ে-দুইয়ে চার করতে কারও দেরি হল না। খবর পেয়ে গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল সরযূদেবীর বাড়িতে।

জয়লাল বলল, "আমি আগেই জানতাম এরকম হবেই।"

তারক তর্কালঙ্কার খিঁচিয়ে উঠে বলল, "কী জানতে শুনি?"

"ওহে, কোনও জিনিসেরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বেশি করিৎকর্মা লোক দেখলেই বুঝতে পারি মতলব খারাপ। এই যে দানু দু' দিনে তিরিশ-চল্লিশটা গাছের নারকোল পাড়ল, একদিনে অত বড় পুকুরের পানা পরিষ্কার করল, ফুটবল খেলতে নেমে গন্ডায়-গন্ডায় গোল করল, এসব কি ভাল? এ হল কোপ দেওয়ার আগে ঘাড়ে তেল মালিশ করা।"

তারক বলল, "ওহে, বিজ্ঞান প্রমাণ ছাড়া কোনও সত্যকে গ্রহণ করে না। অপরাধবিজ্ঞানও কিন্তু একটা বিজ্ঞান। প্রমাণ কই?"

হারানবাবু এসে উত্তেজিতভাবে বললেন, "আমার বাড়িতেও কাল চোর ঢুকেছিল।"

খগেন তপাদার বললেন, "কী করে বুঝলেন?"

"আমার পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা আমার বালিশের পাশেই থাকে। সকালে উঠে দেখি সেটা চুরি হয়ে গিয়েছে। তারপর ধরো, চ্যবনপ্রাশের কৌটোটা গায়েব, অ্যালার্মক্লকটা হাওয়া, একখানা গেঞ্জি পাওয়া যাচ্ছে না..."

হারানবাবুর মেয়ে খেঁদি পাশ থেকে বলল, "ও বাবা, টর্চটা তো কাল জামাইবাবুকে দিলে? চ্যবনপ্রাশের কৌটো খালি হয়ে গিয়েছে বলে মা তাতে পাঁচফোড়ন রেখেছে। অ্যালার্মক্লকটা তো সারাতে দেওয়া হয়েছে, আর গেঞ্জি আজ সকালে কেচে দেওয়া হয়েছে।"

"অ, তা হবে!"

খগেন তপাদার বললেন, "গা থেকে গয়না খুলে নেওয়া সহজ কাজ নয়। নিশ্চয়ই ঘুমের ওষুধ স্প্রে করা হয়েছিল।"

জয়লাল বলল, "আহা, খাওয়াতেও তো পারে। জলের সঙ্গে গুলে দিলেই হল!"

তারক বলল, "জল কেন, দুধ কী দোষ করল?"

দানু যে একাজ করতে পারে তা অবশ্য অনেকের বিশ্বাস হল না। কিন্তু সবচেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল প্রাণারামের। বলতে কী, সে-ই তো দানুকে পিসির বাড়িতে বহাল করেছিল!"

ভূপেনদারোগা তদন্তে এসে সব দেখেশুনে গম্ভীরভাবে বললেন, "ফুটবল খেলোয়াড় চোর হয় জীবনে এই প্রথম দেখলাম মশাই। বেঁচে থাকলে আরও কত দেখতে হবে!"

দ্বিজেন সামন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বিগলিত মুখে বলল, "যেমন-তেমন খেলোয়াড় নয় ভূপেনবাবু, হবিবপুরকে পাঁচ গোল

দিয়েছিল একাই।"

ভূপেনদারোগা মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বললেন, "ফুঃ, পাঁচ গোল! তার মধ্যে দু'টো তো পরিষ্কার অফসাইড। রেফারি হবিবপুরকে একটা ন্যায্য পেনাল্টি দেয়নি।"

কালীপদবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, "না না, এটা কী বলছেন দারোগাবাবু? সেদিন তো আমরাই তিন-তিনটে ন্যায্য পেনাল্টি পাইনি। তিনবারই দানুকে পেনাল্টি বক্সে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।"

ভূপেন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমাকে বাধ্য হয়েই প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। ফুটবলে ল্যাঙাল্যাঙি হয়েই থাকে, নতুন কিছু নয়। ওরকম আনাড়ি প্লেয়ার জন্মে দেখিনি। যত না খেলে, তার চেয়ে বেশি আছাড় খায়। আর গোলগুলো তো ফাঁকতালে হয়ে গিয়েছে। একটাও ক্রিয়েটেড গোল নয়, চান্স গোল।"

এবার হারানবাবু বেশ গরম হয়েই বললেন, "কাকে আনাড়ি বলছেন ভূপেনবাবু? ওকে যে লোকে 'পায়েসপুরের মারাদোনা' বলে ডাকে?"

তেমনই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ভূপেনদারোগা বলে উঠলেন, "রেখে দিন মশাই মারাদোনা! মারাদোনা গাছে ফলে কিনা! ড্রিবলিং নেই, পাসিং নেই, বল প্লে নেই, মারাদোনা বললেই হল? এমনকী, মারাদোনার হাইটটা পর্যন্ত নেই! তালগাছের মতো ঢ্যাঙা একটা ছেলে ল্যাঙপ্যাঙ করে দৌড়চ্ছে, যেন অ্যানিমেটেড কার্টুন! দুর দুর, যে যাই বলুক, আপনাদের পায়েসপুরের মারাদোনা জাতের খেলোয়াড়ই নয়।"

মদনপাগলা ভিড় দেখে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। এবার বলে উঠল, "ওরে, ভূপেনের শ্বশুরবাড়ি যে হবিবপুরে?"

একটা সেপাই ক্যাঁক করে তাড়াতাড়ি মদনপাগলার ঘাড় ধরে তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

ভূপেনবাবু বললেন, "পরের ম্যাচে দেখবেন, হবিবপুরের কাছে পায়েসপুর উড়ে যাবে। সেদিন রথীন হাজরা খেলেনি, তাই! আর আপনাদের দানুও তো শুনছি পালিয়েছে। তা পালাবে না, প্রতি ম্যাচেই তো আর বরাতজোরে গোল করা যাবে না? হেঁ-হেঁ বাবা, ফুটবল অত সোজা জিনিস নয়।"

এবার দেশপ্রেমিক তথা পায়েসপুরমুগ্ধ হারাধনবাবু এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে বললেন, "পায়েসপুরের গৌরব দানুকে আমরা ফিরিয়ে আনবই।"

ভূপেনদারোগা ব্যঙ্গ গলায় বললেন, "আর হাসাবেন না মশাই, দানু তো শুনি পায়েসপুরের ছেলেই নয়। তার বাড়ি তো প্রতাপগড়ে?"

হারাধনবাবু একটু মিইয়ে গিয়ে বললেন, "না না, তা কী করে হবে?"

ভূপেনবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, "হবিবপুরের লোকেরা এর জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে তা জানেন? তার উপর সে একজন চোর এবং অপরাধী। একজন অপরাধীকে লুকিয়ে রেখে এবং আশ্রয় দিয়ে আপনারা প্রশাসনকে প্রতারণা করেছেন বলেও আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। আমি হুলিয়া দিয়ে দিচ্ছি। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দানুকে ধরে হাজতে পোরা হবে। নেক্সট ম্যাচ পর্যন্ত যাতে সে জামিন না পায় আমি তারও ব্যবস্থা করব।"

হারাধনবাবু অত্যন্ত ব্যথিত সুরে বললেন, "সেটা কি পায়েসপুরের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হবে না? পায়েসপুরের ঐতিহ্যের কথা একবার ভেবে দেখুন!"

ভূপেনবাবু তেরিয়া হয়ে বললেন, "পায়েসপুরের আবার ঐতিহ্য কিসের মশাই? এ তো অখদ্দে জায়গা। চোর-গুন্ডা-বদমাশ গিজগিজ করছে। পায়েসপুরের কুমড়ো নাকি ভুবনবিখ্যাত। তা সেদিন কে যেন একটা পায়েসপুরের কুমড়ো নিয়ে এসেছিল। খেয়ে দেখি, একেবারে জোলো আর পান্‌সে। সেই কুমড়ো শেষে গোরুকে খাওয়ানো হয়েছিল। পায়েসপুরের গামছার কথা আর বলবেন না মশাই, জলে দিলেই গলগল করে রং উঠে যায়। অথচ সেই গামছা নিয়ে নাকি কবিতা লেখা হয়েছে! আপনিই না বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, আপনাদের বিজ্ঞানী হলধর ঘোষ একদিন নোবেল প্রাইজ পাবেন? তা তাঁর 'ইন্ধনহীন রন্ধন'-এর উনুনে তো আজ অবধি জলও গরম হল না! আপনাদের ব্যায়ামবীর বটেশ্বর তো আরশোলা দেখলে ভয়ে মূর্ছা যায়। আর কত শুনবেন?"

কথাটা শুনে ভিড়ের পিছনে হলধর ঘোষ টুপ করে তাঁর মাথাটা নামিয়ে নিলেন।

ভূপেনবাবু সদম্ভে বুটের শব্দ তুলে বিদায় নিলেন।

প্রাণারামের মন ভারী খারাপ। বলতে কী, সে-ই দানুকে পিসিমার বাড়িতে বহাল করেছিল। পিসিমা আজ সকালেই তাকে বলেছেন, "ওরে পান্টু, শেষে তুই আমার এত বড় সর্বনাশ করলি?" শুনে পান্টু ওরফে প্রাণারামের লজ্জায় মাটিতে মিশে যাওয়ার কথা। দানুকে সারাদিন তারা সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজেছে। কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রতাপগড়েও খোঁজ নিতে লোক গিয়েছিল। তারা এসে বলেছে, ও নামে প্রতাপগড়ে কেউ কখনও ছিল না। এমনকী, ওরকম চেহারারও কেউ নেই। দানু যে চোর এটা বিশ্বাস করতে প্রাণারামের মন চাইছে না। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণ দানুর বিপক্ষেই যাচ্ছে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মলিন মুখ করে জানালার পাশে চেয়ারে বসে ঘটনার বিশ্লেষণ করতে-করতে পান্টু মাথা নেড়ে অস্ফুট গলায় বলে ফেলল, "নাঃ, দানুকে চাই।"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জানালার বাইরে দানুর গলা শোনা গেল, "আমাকে খুঁজছ?"

স্তম্ভিত প্রাণারাম কিছুক্ষণ হাঁ করে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে থেকে বলল, "তুই! তুই কোথায় ছিলি হতভাগা? তোর নামে যে হুলিয়া বেরিয়েছে?"

"কেন?"

"সবাই বলছে তুই নাকি পিসিমার গয়না চুরি করে পালিয়েছিস?"

"গয়না চুরি যাবে কেন?"

"তা হলে গয়নাগুলো গেল কোথায়?"

গলার ঘামাচি চুলকোচ্ছিল বলে পিসিমা নিজেই হারটা খুলে ঘুমচোখে বালিশের নীচে রেখেছিলেন। রাখতে গিয়ে সেটা ওয়াড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। সেখানেই আছে।"

"আর বালা?"

"পিসিমার বড্ড ভুলো মন। কাল পোস্ত বাটতে গিয়ে বালা খুলে তেজপাতার কৌটোর পিছনে রেখেছিলেন, তারপর ভুলে গিয়েছেন।"

"তা হলে তুই পালালি কেন?"

"না পালিয়ে উপায় নেই। আমাকে একজন ধরতে এসেছে!"

"তোকে ধরতে এসেছে? তোকে ধরবে কেন?"

"সব কথা বলা যাবে না। আমার খুব বিপদ। তবে খুব যদি দরকার হয় তা হলে আমাকে ডেকো, ডাকলেই আসব।"

"আমার ডাক তুই শুনতে পাবি কী করে?"

দানু বড়-বড় দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, "তোমার ডাক আমি ঠিক শুনতে পাই। তবে এ কথাটা কাউকে বোলো না।"

"তোর কিসের বিপদ আমাকে বলবি না? আমরা তো তোর বিপদে সাহায্য করতে পারি!"

"পরে তোমাকে সব বলব। এখন যাই?"

"যা!"

দানু চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু তার কথামতো বালিশের ওয়াড়ের ভিতরে আর তেজপাতার কৌটোর পিছনে সরযূদেবীর হারানো গয়না পাওয়াও গেল। ফের পায়েসপুরের মাতব্বররা জড়ো হয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমুল আলোচনা করলেন।

ভূপেনদারোগাকে যখন ঘটনাটা জানানো হল, তখন উনি ভ্রু তুলে বললেন, "তাই নাকি? তা হলে কী সাব্যস্ত হল?"

হারাধনবাবু এগিয়ে এসে বুক চিতিয়ে বললেন, "তাতে এই সাব্যস্ত হল যে, দানু মোটেই চুরি করেনি এবং নেক্সট ম্যাচে হবিবপুরের বিরুদ্ধে খেলবে।"

ভূপেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না, খেলবে না।"

"কেন খেলবে না বলুন?"

"তার বিরুদ্ধে আরও একটি গুরুতর অভিযোগ আছে। ম্যাচের দিন সে হবিবপুরের লোকজনের উপর হামলা করেছিল। তার সেই হামলায় কয়েকজন গুরুতর আহতও হয়। হবিবপুরের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উপর বিনা প্ররোচনায় এই আক্রমণ অত্যন্ত নিন্দনীয়।"

হারাধনবাবু এবং কালীপদবাবু একযোগে বলে উঠলেন, "না স্যার, সেদিন হবিবপুরের গুন্ডারাই ম্যাচ হেরে গিয়ে আমাদের উপর চড়াও হয়। আমরা থানায় নালিশও জানিয়েছি।"

"আপনাদের পাঁচ মিনিট আগে হবিবপুর এফ আই আর করেছে। সুতরাং তাদের কেস অনেক জোরালো।"

সবাই কাঁচুমাচু হয়ে পাংশু মুখে ফিরে এলেন। এবং সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, এই রকম অন্যায়ভাবে হবিবপুরের কাছে হেনস্থা হওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক। হারাধনবাবু অত্যন্ত ব্যথিত মুখে বলতে লাগলেন, "না হে, এখন আমাদের পায়েসপুরের বড় দুঃসময় চলছে।"

পরশুদিন সন্ধের সময় যখন এই ঘটনা নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে মিটিং চলছিল, তখনই খবর আসে যে, বটেশ্বরকে এক নরখাদক সাধু ধরে নিয়ে গিয়েছে। এবং সেটা নিয়ে তোলপাড় শেষ হতে না-হতেই রাধাগোবিন্দর নিরুদ্দেশ হওয়ার খবরে পায়েসপুর একেবারে শোকে স্তব্ধ হয়ে গেল।

ভূপেনদারোগা তদন্তে এলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন গা ছাড়া ভাব। বটেশ্বরের খবর শুনে নাক কুঁচকে বললেন, "পায়েসপুরে কেমন পালোয়ান তৈরি করেন আপনারা বলুন তো? নেংটি পরা একটা সাধু এসে একটা তাগড়াই লোককে তুলে নিয়ে গেলেই হল? তেমন পালোয়ান থাকা না-থাকা সমান। ওরকম অপদার্থকে যদি সাধু কেটেকুটে রান্না করে খেয়ে ফেলেই থাকে, তা হলে একরকম ভালই হয়েছে! আর রাধাগোবিন্দবাবু! হাঃ হাঃ। তিনি নাকি ডাকসাইটে দারোগা ছিলেন! হেসে বাঁচি না। যখন যেখানে বদলি হয়ে যেতেন, সেখানেই চোর-ডাকাতদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যেত। একবার তো কালিকাপুরের ডাকাতরা তাঁকে গণসংবর্ধনাও দিয়েছিল। আর দেবে না-ই বা কেন? সকালে একপেট ভাত খেয়ে সেই যে থানার চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়তেন, সেই ঘুম ভাঙত বিকেল পাঁচটায়, তাঁর বাড়ি যাওয়ার সময়। তাঁর মতো লোক বটেশ্বরকে উদ্ধার করতে গিয়ে লোপাট হয়েছেন, এও কি বিশ্বাস করতে বলেন? তিনি আবার 'দারোগার দীর্ঘশ্বাস' নামে বই লিখছেন। হুঁঃ! দারোগাগিরির উনি জানেনটা কী?"

কেপুবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, "কিন্তু নিকুঞ্জ বৈরাগী যে বলেছিল, রাধাগোবিন্দবাবু রেগে গেলে খ্যাপা ষাঁড়!"

ষাঁড় কথাটা খারাপ নয়। 'অকালষেঁড়ে' বলে কী একটা কথাও যেন আছে। রাধাগোবিন্দবাবু হচ্ছেন তাই। তবে আপনারা যাই বলুন, ওই সাধুর গল্পটি আমি বিশ্বাস করছি না। ওটা আষাঢ়ে গল্প। আমার সেপাইরা সারা জঙ্গল তছনছ করে খুঁজে এসেছে, কোথাও কোনও সাধুর চিহ্নমাত্র দেখেনি।"

জয়লাল বলল, "তা হলে ওরা গেল কোথায়?"

"আত্মীয়স্বজন বা কুটুমদের বাড়ি খুঁজে দেখুন। বাড়িতে ঝগড়া করে বৈরাগী হয়েছে কিনা খোঁজ নিন। তবে লাশটাশ পাওয়া গেলে খবর দেবেন, তখন এসে দেখব। এখন আমার সময় নেই। চারদিকে খুব চুরি-ডাকাতির খবর পাচ্ছি। কিছু খুনখারাপিও হচ্ছে। আমাকে তদন্তে যেতে হবে।"

ফুটবল ম্যাচে হবিবপুর পাঁচ গোল খাওয়ার পর থেকেই যে ভূপেনদারোগা পায়েসপুরের উপর চটে আছেন, তাতে সন্দেহ নেই। দারোগা চলে যেতেই দ্বিজেন সামন্ত উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, "ভাইসব, এর পরের ম্যাচে কিন্তু হবিবপুরের কাছে আমাদের হেরে যেতেই হবে। না হারলে আমাদের উপর এই অবিচার বন্ধ হওয়ার নয়, এই বলে দিলুম। এখন কয় গোল খাবে তা ঠিক করে নাও। আমার তো মনে হয়, পাঁচ গোল খাওয়াই ভাল। ওদের প্লেয়ার গোল দিতে পারে ভাল, নইলে আমাদের প্লেয়াররাই সেমসাইড গোল খেয়ে বসবে'খন।"

হারাধনবাবু লাফিয়ে উঠে গর্জন করলেন, "কভি নেহি! প্রাণ থাকতে নয়!"

"কিন্তু না হারলে যে ভূপেনদারোগা আমাদের হাল কেরাসিন করে ছাড়বে।"

"যা খুশি করুক, যা হয় হোক। পায়েসপুর কারও কাছে কোনও দিন মাথা নোয়ায়নি, আজও নোয়াবে না। ঝড়ঝঞ্ঝা যাই আসুক, দুর্গম-গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার পাড়ি দিতে হবে। পায়েসপুরের দুঃসময় চলছে ভাইসব, তোমরা প্রস্তুত থেকো। কিন্তু চিরকাল এরকম যাবে না। পায়েসপুরে আবার একদিন সূর্য উঠবে।"

পরদিন সকালে পায়েসপুরে ঢুকে গদাইয়ের মনে হল, এ যেন সেই পায়েসপুর নয়। না, সেই পায়েসপুরই। সেই শ্মশান, সেই গোচারণ, সেই ফটিক রাজার ঢিবি, খেলার মাঠ, ইশকুলবাড়ি, সব ঠিক আছে। তবে চারদিকটা দুঃখ আর বিষাদ মাখানো। সারা গাঁয়ে যেন একটা দুঃখের হাওয়া বইছে। কাকের ডাকেও কেমন যেন মন খারাপের ভাব। গাছগুলোও হাওয়ায় দুলছে বটে, কিন্তু যেন খুব অনিচ্ছের সঙ্গে। দুলতে হয় বলে দোলা। গোরুর হাম্বার মধ্যেও যেন শচীমাতার 'নিমাই' ডাক।

ময়লা পাতলুন, ময়লা জামা, কাঁধে ঝোলা, গদাই চারদিকে চেয়ে দুঃখটা খুব টের পাচ্ছিল। সে পায়েসপুরের লোক নয় বটে, কিন্তু জায়গাটা তার চেনা। বেশ হাসিখুশি জায়গা। কিন্তু আজ হঠাৎ গাঁয়ে এত দুঃখ কেন ঢুকে পড়ল, সেটা ঠিক বুঝতে পারছিল না গদাই।

নগেন সর্বাধিকারীর বেশ বড় দোতলা বাড়ি। সামনে একটু বাগান আছে, বাগানের পর চওড়া বারান্দা, তারপর কোঠা। বারান্দায় জুত করে বসে গদাই হাঁক মারল, "কর্তা আছেন নাকি?"

পাংশু মুখে বেরিয়ে এসে নগেন কাহিল গলায় বললেন, "গদাই নাকি রে? তাগাদায় এসেছিস বুঝি?"

"আহা, শুধু তাগাদা কেন, খবরবার্তা নিতেও আসা।"

নগেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আর খবরবার্তা! দিন ঘনিয়ে এল বলে। বয়স হয়েছে, তাই নিজের জন্য ভাবনা নেই। কিন্তু নির্বংশ হয়ে যাব, এইটেই এখন চিন্তা।"

"বলেন কী নগেনকর্তা? নির্বংশ হতে যাবেন কোন দুঃখে?"

"সে অনেক কথা রে বাপু! তা বাতের তেল বাবদ তোর কত পাওনা যেন? আজই নিয়ে যা বাবা, ঋণ রেখে মরলে নরকবাস ঠেকায় কে?"

"আজ্ঞে, পাওনা বেশি নয়, কুল্লে পঁচিশটি টাকা। কিন্তু আপনাকে যে বড় কাতর দেখাচ্ছে কর্তা? একটু ভেঙে বললে হয় না?"

ফঁত করে একটা বড় শ্বাস ফেলে নগেনবাবু বললেন, "সে আর বলিসনি বাবা, বড় বিপদের মধ্যে আছি। এক ভয়ংকর সন্ন্যাসীর কোপে পড়ে আমার বংশ লোপ হওয়ার জোগাড়।"

"আহা, সব রোগেরই তো নিদান আছে, না কি? সমস্যা থাকলে উপায়ও হয়ে যায়।"

"তা হওয়ার নয় রে! পঁচাত্তর বছর আগে এক বিভীষণ সন্নিসি আমার বাবাকে একটা পিদিম দিয়ে হুঁশিয়ার করে গিয়েছিল, সে পিদিম ফেরত নিতে পঁচাত্তর বছর পর আবার আসবে। তখন বিশ্বাস করিনি বাবা। সে সত্যিই এসেছে, কিন্তু পিদিমের হদিশ নেই। ক'দিন আগে বাড়িতে একটা চুরি হয়েছিল বটে, তবে বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। তা সেই পিদিমখানাই নিয়ে গেল কিনা বুঝছি না। বড় বিপদ যাচ্ছে বাবা।"

"ঘাবড়াবেন না কর্তা। একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে বলুন দেখি, ইদানীং বেশ বড়সড় চেহারার করিৎকর্মা কোনও লোকের কি হঠাৎ এ গাঁয়ে আগমন হয়েছে?"

"বড়সড় চেহারার করিৎকর্মা লোক? কেন রে বাপু, হঠাৎ এ কথা কেন?"

"কারণ আছে কর্তা। হয়ে থাকলে বলুন।"

"না, সেরকম কিছু তো চোখে পড়েনি! তবে ইদানীং দানু নামে একটা খুব ঢ্যাঙা ছেলে আমার মেয়ে সরযূর বাড়িতে এসে জুটেছিল বটে। সে খুব করিৎকর্মা বলে শুনেছি। দারুণ নাকি ফুটবলও খেলে। হবিবপুরকে সে পাঁচ গোল দিয়েছিল বলে গাঁয়ে বড় অশান্তিও হচ্ছে রে বাপু! তবে দানুকে ক'দিন হল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তুই বরং আমার নাতি পান্টুর সঙ্গে কথা কয়ে দ্যাখ তো!"

পান্টু ওরফে প্রাণারাম শুনেই বলল, "দানুর খবর চাও? ওঃ, তা হলে তো তুমি পুলিশের স্পাই!"

গদাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "সে চেষ্টা কী আর করিনি রে বাপু? কিন্তু পুলিশ তো মোটে আমাকে আমলই দিল না।"

"তা হলে দানুর খবর দিয়ে কী করবে?"

"ভালর জন্যই বলছি, দানুকে আর লুকিয়ে রাখাটা তোমার উচিত হবে না। সে যদি পিদিমের সেই দত্যিটাই হয়ে থাকে, তা হলে তাকে পিদিম সমেত সাধুবাবাকে ফেরত দেওয়াই উচিত হবে। দানুর জন্য দু'-দু'টো নিরীহ লোক সাধুর হাতে খাবি খাচ্ছে। তার উপর নির্বংশ হওয়ার ভয়টাও তো উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।"

পান্টু হোঃ হোঃ করে হেসে বলল, "তুমি দাদুর ওই আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করো বুঝি? প্রদীপ থেকে দৈত্য বেরোয়, এ তো রূপকথা! তবে সাধুটা যে পাজি তা আমরা জানি। আমরা দল বেঁধে লাঠিসোঁটা নিয়ে তার ডেরা খুঁজে বের করবই।"

"ওরেব্বাস রে! ও কাজও কোরো না। কোনও মনিষ্যির সাধ্যিই নেই তার কিছু করে। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে বাবা! পিদিম না পেলে সে যে গাঁয়ে ঢুকে কী কুরুক্ষেত্র বাধাবে কে জানে।"

"পিদিম! পিদিম তো আমাদের কাছে নেই! চুরি হয়ে গিয়েছে।"

চোখ বড়-বড় করে গদাই বলল, "নেই! তা হলে তুমি দানুকে পেলে কোথায়? তার তো পিদিম থেকেই বেরনোর কথা!"

"তোমার মাথা! দানু মোটেই পিদিম থেকে বেরোয়নি।"

"তা হলে!"

"আচ্ছা, তোমার কি ঘটে কোনও বুদ্ধি নেই? চিরকাল বুজরুকি গল্পে বিশ্বাস করে যাবে? পিদিমের মধ্যে কি কোনও মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে?"

"আহা, মানুষ পারবে কেন? তবে দত্যিদানোরা যে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করতে পারে?"

"দত্যিদানো বলেও কিছু নেই। ওসব মানুষের অলস কল্পনা। সূক্ষ্ম দেহটেহ সব বাজে কথা। এখন কেটে পড়ো!"

গদাই উঠতে-উঠতে বিড়বিড় করে বলল, "ভাল কথাটা শুনলে না বাবা, ঠেলা বুঝবে!"

ঠেলা টের পেতে দেরি হল না পান্টুর। গদাই পায়েসপুরের ঘরে-ঘরে খবরটা ছড়িয়ে দিয়ে সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেল। আর খবরটা খেয়েও গেল সবাই। নগেনবাবুর বাবার আমলের পিদিমের কথা কানাঘুষোয় সবাই শুনে গিয়েছিল। দানুর কীর্তিকাহিনির কথাও সবাই জানে। এবং সাধুর আগমন নিয়ে তো কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই। সেই সঙ্গে প্রদীপের দৈত্য দানুর জন্যই যে আজ পায়েসপুরের দুঃসময় এসেছে, সে বিষয়েও কারও আর সংশয় রইল না।

সন্ধেবেলায় চণ্ডীমণ্ডপে জরুরি মিটিং ডাকা হল। সেই মিটিঙে সর্বসমক্ষে নগেন সর্বাধিকারী সাধুর দেওয়া পিদিমটার কথা স্বীকার করলেন। তবে এও বললেন, "পিদিমের মহিমার কথা আমি জানি না। আমার বাবা হয়তো জানতেন, কিন্তু আমাদের পিদিম নিয়ে নাড়াচাড়া করায় বারণ ছিল।"

জয়লাল বলল, "আঃ হাঃ, বিরাট দাঁওটা ফসকেছেন দাদা! এতদিনে তো আপনার টাটা-বিড়লা হয়ে যাওয়ার কথা!"

হারাধন বললেন, "আগে জানলে তো পায়েসপুরকে একেবারে অলকাপুরী বানিয়ে ছাড়তাম মশাই। আগে বলতে হয়! এসব খবর চেপে রাখাটা ভুল হয়েছে।"

তারক সভয়ে বলল, "যাকগে, ওসব ভেবে আর লাভ নেই। পিদিমের মেয়াদ শেষ হয়েছে, যার পিদিম সে ফেরত নিতে এসেছে এবং পায়েসপুরের সামনে এখন ঘোর বিপদ। সুতরাং পান্টুকে ডাকা হোক। পিদিম তার কাছেই আছে এবং দানুই যে পিদিমের দৈত্য, সে বিষয়েও আর সন্দেহের অবকাশ থাকছে না।"

এ কথায় সবাই একমত হল। কিন্তু পান্টু এসে সবার সামনে বলল, "আমি পিদিম কখনও চোখেও দেখিনি। দানু মোটেই দৈত্যদানো নয়।"

দ্বিজেন সামন্ত চেঁচিয়ে উঠে বলল, "দানু দৈত্য নয় বললেই হবে? দৈত্য না হলে কেউ দু'দিনে চল্লিশ-পঞ্চাশটা গাছের নারকোল পেড়ে ফেলতে পারে? এত বড় পুকুরটার কচুরিপানা একদিনে তুলে ফেলতে পারে? নাকি হবিবপুরের মতো শক্ত টিমকে পাঁচ-পাঁচখানা গোল দিতে পারে?"

সবাই হইচই করে দ্বিজেনকে সমর্থন জানাল। দু'-চারজন পান্টুর পক্ষ নেওয়ার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু তারা নিতান্তই সংখ্যালঘু।

সকলের সমবেত বাক্যবাণে এবং উগ্রতা দেখে পান্টু যখন কোণঠাসা, তখনই হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে দানু চণ্ডীমণ্ডপে উঠে এসে বলল, "ওকে ওরকম হেনস্থা করছেন কেন? যা বলার আমাকে বলুন।"

প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই রে রে করে তেড়ে গিয়ে সবাই দানুকে পেড়ে ফেলল। দানু তেমন বাধাও দিল না।

দ্বিজেন সামন্ত বলল, "ভাল করে দড়ি দিয়ে বাঁধো, যাতে পালাতে না পারে। কাল সকালেই ওকে সাধুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদিও প্রদীপের দৈত্যকে দিয়ে অনেক ভাল কাজও হতে পারত, কিন্তু আমরা আর কোনও ঝুঁকি নিতে পারি না। কী বলো ভাইসব?"

সকলেই হইহই করে উঠল, "ঠিক ঠিক!"

॥ ৬ ॥

একদিন সকালবেলায় গাব্বু তার চুরি করা জিনিসপত্তরগুলো বের করে মেঝেয় ছড়িয়ে বসে দেখছিল। তেমন সুবিধে করে উঠতে পারছে না সে। তার হাত এখনও পাকেনি, ওস্তাদের অনেক গুণই সে অর্জন করতে পারেনি। চুরির জিনিসগুলো নিতান্তই এলেবেলে। রুপোর সিঁদুরের কৌটো, সস্তার দু'টো হাতঘড়ি, একটা টর্চবাতি, কয়েকটা স্টিলের বাটি, গোটা দুই শাড়ি, একজোড়া সোনার মাকড়ি, পেতলের ঘটি, একখানা পেতলের পিদিম, একটা পেতলের মোমদানি, একশিশি চ্যবনপ্রাশ, বেচলে কুড়িয়ে বাড়িয়ে শ'দুয়েক টাকা হতে পারে। মহাজন তাও দেবে কিনা সন্দেহ। ইদানীং চোরাই জিনিস কিনতে চাইছে না। সোনার মাকড়ি দু'টোই যা বিকোবে। তবে খুবই হাল্কা জিনিস।

গাব্বু একটু উদাস চোখে জিনিসগুলো দেখতে-দেখতে তার নিজের অপদার্থতার কথা ভাবছিল। সে বংশানুক্রমেই চোর। তার ঠাকুরদা চোর ছিল, বাবা চোর ছিল এবং তাদের বেশ নামডাকও হয়েছিল। কিন্তু গাব্বু নিতান্তই কুলাঙ্গার। এই সব ভাবতে-ভাবতে সে জিনিসগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখতে হঠাৎ পিদিমখানা হাত ফসকে পড়ে যেতেই ঠঙাৎ করে শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিদ্যুতের মতো ঝলকানি। বোমা মনে করে গাব্বু আঁতকে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। চোখ খুলে সে কাঠ। সামনে একটা পেল্লায় চেহারার দানব দাঁড়িয়ে আছে, মাথা ঠেকেছে ঘরের চালে। গায়ে জরির পোশাক ঝলমল করছে। হাতজোড় করে ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, "হুকুম করুন হুজুর!"

ব্যাপারটা একদম বুঝতে না পেরে গাব্বু হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে

থেকে ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "আপনি কে?"

"আমি আপনার বান্দা, আপনার খিদ্‌মতে হাজির।"

গাব্বু চোখ কচলাল, নিজের পেটে চিমটি দিল। তবু ঘুম ভাঙল না দেখে একটু অবাক হয়ে বলল, "নাঃ, ঘুমটা বেশ চেপে এসেছে দেখছি।"

"আপনি ঘুমোচ্ছেন না মালিক, জেগেই আছেন। আমি ওই চিরাগের দৈত্য। মালিকের হুকুম তামিল করাই আমার কাজ। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখুন।"

গাব্বু ভয়ে কিছুক্ষণ সিঁটিয়ে থেকে ব্যাপারটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল। এটা কোনও ঘাপলা নয়তো? কোনও চক্রান্ত? তাকে বিপদে ফেলার ফাঁদ? তারপর একটু-একটু সাহস ফিরে এল তার। একটু ঢোক গিলে গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "যা বলব তাই করবেন?"

"আলবাত মালিক।"

"যাঃ, বিশ্বাস হচ্ছে না!"

"হুকুম করেই দেখুন।"

"একহাঁড়ি রসগোল্লা আনুন তো দেখি।"

দৈত্য হুশ করে গেল আর এল। হাতে এক বড় হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা।

চোখ বড়-বড় করে ব্যাপারটা দেখল গাব্বু। বিশ্বাস হচ্ছে না বটে, তবু দু'খানা রসগোল্লা টপাটপ খেয়ে দেখল, অতি ভাল জাতের জিনিস। বলল, "আপনিও দু'টো খান!"

দৈত্য মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের খাওয়ার হুকুম নেই হুজুর! আর কী করতে হবে আদেশ করুন!"

গাব্বু চারদিক চেয়ে তার জীর্ণ ঘরখানা দেখল। আসবাব কিছুই নেই। বর্ষায় চাল দিয়ে জল পড়ে। হাঁড়ির হাল। সে বলল, "বাড়িখানা পাকা করে দিতে পারেন?"

"আলবাত।"

বলেই দৈত্যটা হুশ করে অদৃশ্য হয়েই ফিরে এল। গাব্বু অবাক হয়ে দেখল, তার ঘর রীতিমতো ঝকঝকে দালানকোঠায় পরিণত হয়েছে। ফের হুকুম দিতেই আসবাবপত্র, খাট-পালঙ্কও চলে এল। খিদে পেলেই খাবার এসে যাচ্ছে। তেষ্টা পেলেই জল বা শরবত।

গাব্বু বলল, "মজা মন্দ নয় তো!"

তা তিনটে দিন ভারী মজায় কেটে গেল গাব্বুর। জুতো, জামা, ছাতা, লাঠি কিছুরই অভাব নেই। তবে শুয়ে-বসে, আয়েশ করে তিনটে দিন কাটিয়ে দেওয়ার পর তার ভারী একঘেয়ে লাগল। নাঃ, এরকম নিষ্কর্মার জীবনে তার ঠিক জুত হচ্ছে না। তার হাত-পা অন্য কিছুর জন্য নিশপিশ করছে। তার বাবা দশরথ রাতে চুরি করতে বেরিয়ে যেত, ফিরত ভোরবেলায়। কোনও-কোনও দিন মেলা জিনিস নিয়ে আসত, কোনও দিন বা খালি হাতে। তখন থেকেই সে ঠিক করে রেখেছিল বাবার মতো চোর সে হবে না। উঞ্ছবৃত্তি তার পছন্দ নয়। বড় হয়ে সে হবে ডাকাত। এক-একটা ডাকাতিতে যা রোজগার হয় তাতে মাস কেটে যায়। কিন্তু সাহস আর দলবলের অভাবে সে ডাকাত হয়ে উঠতে পারেনি। হল ছিঁচকে চোর। আর চুরি করতে গিয়ে হেনস্থা ও অপমান কি কম জুটেছে তার কপালে? বাখরগঞ্জের গেরস্ত নীলমণি রায় তাকে দিয়ে পা টিপিয়ে নিয়েছিল। খাগড়াহাটের লোকেরা তাকে ধরে মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে গাঁয়ে ঘুরিয়েছিল। সাত হাত নাকে খত দিতে হয়েছিল নবীনগরে ব্যোমকেশবাবুর বাড়িতে ধরা পড়ে যাওয়ায়। সেই সব মনে পড়ায় মাথাটা বড্ড গরম হয়ে গেল তার।

সে দৈত্যকে হুকুম করল, "ওহে, আমার এরকম আরামে সময় কাটাতে ইচ্ছে করছে না। আমি আজ ডাকাতি করতে বেরোব। তার সব ব্যবস্থা করো।"

"জো হুজুর!"

ঘোড়ায় চেপে মাঝ রাত্তিরে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে সে ফরাশডাঙা গাঁয়ে হাজির হল। ফরাশডাঙায় বিস্তর মহাজনের বাস। তাদের পাইক বরকন্দাজও আছে। তারা লাঠি-সড়কি নিয়ে তেড়ে এল, কেউ-কেউ গুলিও চালাল বটে। কিন্তু দৈত্য পটাপট তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে গাব্বুর পথ পরিষ্কার করে দিল। মোট পাঁচটা গদি লুট করে মহানন্দে ফিরে এল গাব্বু। তীব্র আনন্দে তার শরীরের রক্ত গরম, মনে তৃপ্তি আর আনন্দ। দু'টো দিন আরাম আর বিশ্রাম নিয়ে তিনদিনের দিন প্রতাপগড়ে হাজির হল সে। জমিদার বিষ্ণুচরণের বাড়ি আর মগনলাল মহাজনের গদি সাফ করে ফিরে এল। তার পিস্তলের গুলিতে মগনের দরোয়ান বীরবাহাদুর জখম হল। তিনদিন পর সে সামতাপুরের গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সাফ করে নিয়ে এল। চারদিকে সবাই যে গাব্বু ডাকাতের কথা আলোচনা করছে, সেটাও কানে এল তার। হ্যাঁ, এই হচ্ছে জীবন। এরকমভাবেই বাঁচতে চেয়েছিল সে।

পর পর ডাকাতির চোটে ভূপেনদারোগার নাওয়াখাওয়া যে ঘুচে গিয়েছে এটা আন্দাজ করে ভারী আহ্লাদ হচ্ছিল তার।

খুশি হওয়ারই কথা। মাসখানেক আগে এই ভূপেনদারোগা তাকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চালান করেননি। নাক সিঁটকে বলেছিলেন, "এঃ, তুই যে একেবারে ছিঁচকে চোর! বিশবার কান ধরে ওঠবোস কর তো!" তাই করেছিল গাব্বু। তারপর তাকে গোটাকতক রুলের ঘা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অপমানটা আজও ভোলেনি গাব্বু।

আজ রাতে তাই পায়েসপুর অভিযানে যাওয়ার আগে সে ঘোড়ায় চেপে হবিবপুর থানায় হানা দিয়ে ভূপেনদারোগার ঘরে ঢুকতেই ভূপেন সিঁটিয়ে গেলেন। গাব্বু বুক ফুলিয়ে বলল, "ওহে ভূপেন, তোমাকে জানিয়েই যাচ্ছি, আজ পায়েসপুর লুট করব। তোমার কিছু করার আছে?"

ভূপেন মাথা নেড়ে বললেন, "আজ্ঞে, না। পায়েসপুরকে দেউলিয়া করে দিলেও কিছুই করব না।"

"সে চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এবার কান ধরে বিশবার ওঠবোস করলেই তোমার ছুটি।"

ভূপেন লাল মুখে, রাগ চেপে আদেশ পালন করে ফেললেন। কারণ, গাব্বুর হাতে এস এল আর বন্দুক, তার পিছনে দশাসই চেহারার দানবাকৃতি স্যাঙাত। সেপাইরা থানা থেকে পালিয়ে গিয়েছে। ভূপেনদারোগা একা!

এই সব গুরুতর কাজ সেরে টগবগে ঘোড়ায় চেপে গাব্বু পায়েসপুর রওনা হল। ঘোড়ার পাশে-পাশে গাব্বুর পোষা দৈত্যও চলেছে। গাব্বু বলল, "ওরে দত্যি!"

"জি হুজুর!"

"আমাকে কেমন দেখছিস?"

"চমৎকার মালিক।"

"কেমন ডাকাতি করি?"

"খুব ভাল হুজুর।"

"তোর কি মনে হয় আমি একদিন দেশের সবচেয়ে বড় ডাকাত হব?"

"আপনার চেয়ে বড় ডাকাত কেউ নেই মালিক!"

"কিন্তু একটু খিঁচ থেকে যাচ্ছে যে?"

"কিসের খিঁচ হুজুর? হুকুম করুন, সব ঠিক করে দেব।"

"এক বালতি দুধে এক ফোঁটা চোনা পড়লে কী হয় জানিস?"

"দুধ কেটে যায়।"

"আমারও যে তাই হচ্ছে।"

"কেন হুজুর?"

"লোকে আমাকে খাতির করছে বটে, কিন্তু সেটা তোর জন্য।"

"আমি তো আপনার গোলাম আছি মালিক।"

"সেইটেই তো হয়েছে মুশকিল। আমার সন্দেহ হচ্ছে, লোকে আমাকে যতটা না ভয় পায়, তার চেয়ে তোকে ভয় পায় অনেক বেশি। এটা কি তাদের উচিত হচ্ছে?"

"না হুজুর। কী করতে হবে হুকুম করুন।"

"আমার মনে হচ্ছে, তুই সব সময় সঙ্গে-সঙ্গে থাকলে ওরা আমাকে ভয় পাবে না। তোর ভয়ে আমাকে মেনে নেবে। আমার তেমন নামও হবে না।"

"জরুর হবে মালিক। হুকুম করুন, সবাইকে সবক শিখিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে। কিন্তু আমার মনটায় বড় খচখচ করছে রে। নামডাক হচ্ছে বটে, লোকে ভয়ও খাচ্ছে! কিন্তু কোথায় যেন এক চিমটি খামতিও থেকে যাচ্ছে।"

"হুজুর, পায়েসপুরের লোকেরা কিন্তু আপনার জন্য তৈরি হয়ে আছে!"

"তার মানে?"

"তাদের হাতে লাঠি, সড়কি, দা এবং বঁটি তো আছেই, দু'জনের হাতে দোনলা বন্দুকও আছে। তারা আপনাকে 'কুটুম' সম্বোধন করে নানারকম গালিগালাজও করছে। তারা নাকি আজ রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে?"

"বাঃ বাঃ! এই তো চাই। পায়েসপুরের লোকেরা তো বেশ বীর দেখছি! যেখানেই যাই সেখানেই লোকেরা সব ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি সোনাদানা, টাকাপয়সা বের করে দেয়, সেলাম ঠুকে পথ ছেড়ে দেয়, হাত কচলায়, ছ্যাঃ ছ্যাঃ! ডাকাতি করাটা যেন জলভাত হয়ে যাচ্ছে। এরকম হলে ডাকাতিতে সুখ কী? একটু লড়ালড়ি হবে, গুলিগোলা চলবে, খুনজখম হবে, লাশ পড়বে, তবে না সুখ!"

"হুজুর, যদি হুকুম দেন তো আগেভাগে গিয়ে ওদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে সব ক'টাকে বেঁধে রেখে আসি।"

"খবরদার না! তাতে আমার নামও হবে না, আনন্দও হবে না। তুই ব্যাটা ডাকাতির বুঝিস কী? লড়ালড়ি না হলে যে শরীরটা গরমই হয় না বাপ! আর শরীর গরম না হলে আনন্দ কিসের? বরং পায়েসপুরের লোকদের আমার অভিনন্দন জানিয়ে দে। তারা যে বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে, তাতে আমি বেজায় খুশি।"

"তারা অভিনন্দন নিতে চাইছে না মালিক। তারা আপনার মুন্ডু চাইছে।"

"বাঃ বাঃ, চমৎকার! ওদের জানিয়ে দে, যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দেব, গুলির সঙ্গে মাথা!"

"গুলিগোলাকে তারা মোটেই ভয় পাচ্ছে না জাঁহাপনা।"

"খুব ভাল, খুব ভাল। সব সময় কি রসগোল্লা খেতে ভাল লাগে রে! মাঝে-মাঝে একটু আখ চিবোতে বা কড়মড় করে ছোলাভাজা খেতেও তো ইচ্ছে যায়।"

"সে কথা ঠিক জনাব!"

পায়েসপুরে ঢুকবার মুখেই বিস্তর লোক সত্যিই পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়ে গাব্বু একটা হুংকার ছাড়ল, "খবরদার! আমার পথ আটকালে তার পরিণাম কিন্তু ভয়ংকর! তোমরা সবাই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করো।"

হারাধনবাবু উলটে চেঁচালেন, "কভি নেহি! বল বীর, চির উন্নত মম শির। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী! পায়েসপুর জিন্দাবাদ।"

জনতাও সঙ্গে-সঙ্গে গর্জন করে উঠল।

তারপর বন্দুকের গুলির আওয়াজ, লাঠির ঠকাঠক, বল্লমের ঝলকের মধ্যে ধুন্ধুমার লড়াই হতে লাগল।

কিন্তু লড়াই খুব বেশিক্ষণ চলল না। পায়েসপুরের লোকেরা রণেভঙ্গ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু দৈত্য তাদের ধরে এনে গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে শামিল করল।

ঘোড়া থেকে নেমে হাসিমুখে গাব্বু বলল, "শাবাশ!"

হারাধনবাবু জ্বলন্ত চোখে চেয়ে বললেন, "এক মাঘে শীত যায় না রে গাব্বু!"

গাব্বু বলল, "দ্যাখো বাপু, বীরত্ব আমি পছন্দ করি বটে, কিন্তু আস্পর্দা আমার একদম সহ্য হয় না। বেয়াদপি করলে পায়েসপুরকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে যাব।"

নগেন সর্বাধিকারী ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "দোহাই বাবা, হারাধনের কথাটায় আমল দিও না। পায়েসপুর আমাদের বড় আদরের গাঁ তো, তাই ফস করে কথাটা বলে ফেলেছে। তা বাবা, তুমি নির্বিঘ্নে লুটপাট করে চলে যাও, কেউ কিছু বলবে না।"

গাব্বু একটু তেরছা হাসি হেসে বলল, "ছোঃ, লুটপাট! লুটপাট করার মতো তোমাদের আছেটা কী মশাই? থাকার মধ্যে ছিল তো এই পিদিমখানা। তা সেটাও কাজে লাগাতে পারনি! অপদার্থ আর কাকে বলে!"

ভিড়ের মধ্যে হলধর ঘোষ পিছন দিকটায় মাথাটা নুইয়ে পাশের গজপতিকে বললেন, "ইস! আমার হিপনোটিক রাইফেলটা যদি তৈরি থাকত, ব্যাটাকে মজা বুঝিয়ে দিতাম।"

অন্য পাশ থেকে ব্রজেন বোস খিঁচিয়ে উঠে বললেন, "তার চেয়ে একটা গাদাবন্দুক আবিষ্কার করলেও তো কাজের কাজ করতে! তোমার রোবট হাত-পা নাড়ল না, তোমার অটোমিস্ত্রি দেওয়ালে একটা পেরেকও পুঁতল না, অটোইস্তিরিকে দিয়ে ইস্তিরিটাও হল না, তা এতদিন ধরে করলেটা কী?"

হলধর কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, গাব্বু একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বলল, "কে রে পিছনের সারিতে ফিসফাস করছিস? কোনও ষড়যন্ত্রের মতলব থাকলে কিন্তু মুশকিল আছে।"

হলধর উবু হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের মুখে হাত চাপা দিলেন।

গাব্বু উচ্চকণ্ঠে বলল, "শোনো হে পায়েসপুরের লোকেরা, পায়েসপুরের মতো একটা দীনদরিদ্র গ্রামে লুটপাট চালানো আমার উদ্দেশ্য নয়। ছুঁচো মেরে আমি হাত গন্ধ করতে চাই না। মাতব্বরের মধ্যে কেউ একজন আমার এই আজ্ঞাবহের হাতে একটা টাকা দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে নিক, তা হলেই হবে।"

খগেন তাড়াতাড়ি হারাধনকে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, "যাও না হে হারাধন।"

হারাধন চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন, "আমি! কভি নেহি!"

"আহা চুপ, চুপ। গলা নামাও। ইংরেজিতে গ্লোরিয়াস রিট্রিট বলে একটা কথা আছে, জানো?"

হারাধন মাথা নেড়ে বললেন, "এখন দেশের দুর্দিনে আপনি কি আমাকে ইংরেজি শেখাচ্ছেন? এখন কি ইংরেজির ক্লাশ নেওয়ার সময়?"

"আহা, এটা হল স্ট্র্যাটেজি।"

হারাধন সমান তেজের সঙ্গে বললেন, "আপনার মতো ইংরেজের ধামাধরা কিছু লোক যে দেশকে আবার পরাধীন করতে চাইছেন, তা আমি জানি।"

নগেন সর্বাধিকারীই এগিয়ে গিয়ে দৈত্যের হাতে একটা টাকা দিয়ে খুব চাপা স্বরে বললেন, "তুমি একদিন আমাদেরই কাজের লোক ছিলে কিন্তু বাপু।"

দৈত্য নির্বিকার গলায় বলল, "এখন আর নই।"

গাব্বু সহাস্যে বলল, "তা হলে পায়েসপুরের হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন তো নগেনবাবু?"

"হ্যাঁ বাবা, করলাম।"

পিছন থেকে কে যেন সরু গলায় বলে উঠল, "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।"

গাব্বু চিৎকার করে উঠল, "কে? কে বলল কথাটা?"

কেউ সাড়া দিল না। সবাই পাথরের মতো চুপ।

গাব্বু দাঁতে দাঁত ঘষে দৈত্যের দিকে চেয়ে হুকুম দিল, "এই ব্যাটা, কথাটা যে বলল তাকে ধরে আন তো!"

চোখের পলকে দৈত্য গিয়ে পিছনের সারি থেকে ক্যাঁক করে একটা ছোকরাকে ঘাড় ধরে তুলে এনে গাব্বুর সামনে ফেলল।

গাব্বু জ্বলন্ত চোখে ছোকরার দিকে চেয়ে বলল, "কে তুই?"

নগেন সর্বাধিকারী কাঁপতে-কাঁপতে উঠে জোড়হাতে বললেন, "ওকে মেরো না বাবা, আমি ওর হয়ে মাপ চাইছি। বয়সের দোষ তো, দুমদাম বলে ফেলে। ও আমার নাতি পান্টু।"

গাব্বু ধমক দিয়ে বলল, "আপনি বসুন। এই হারামজাদা পান্টু, এবার বল তো, কে আমাকে বধ করবে!"

পান্টু গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জবাব দিল না। গাব্বু এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে তার গালে একটা চড় কষিয়ে বলল, "কাপুরুষের মতো লুকিয়ে থেকে আওয়াজ না দিয়ে, বাপের ব্যাটার মতো সামনে এসে
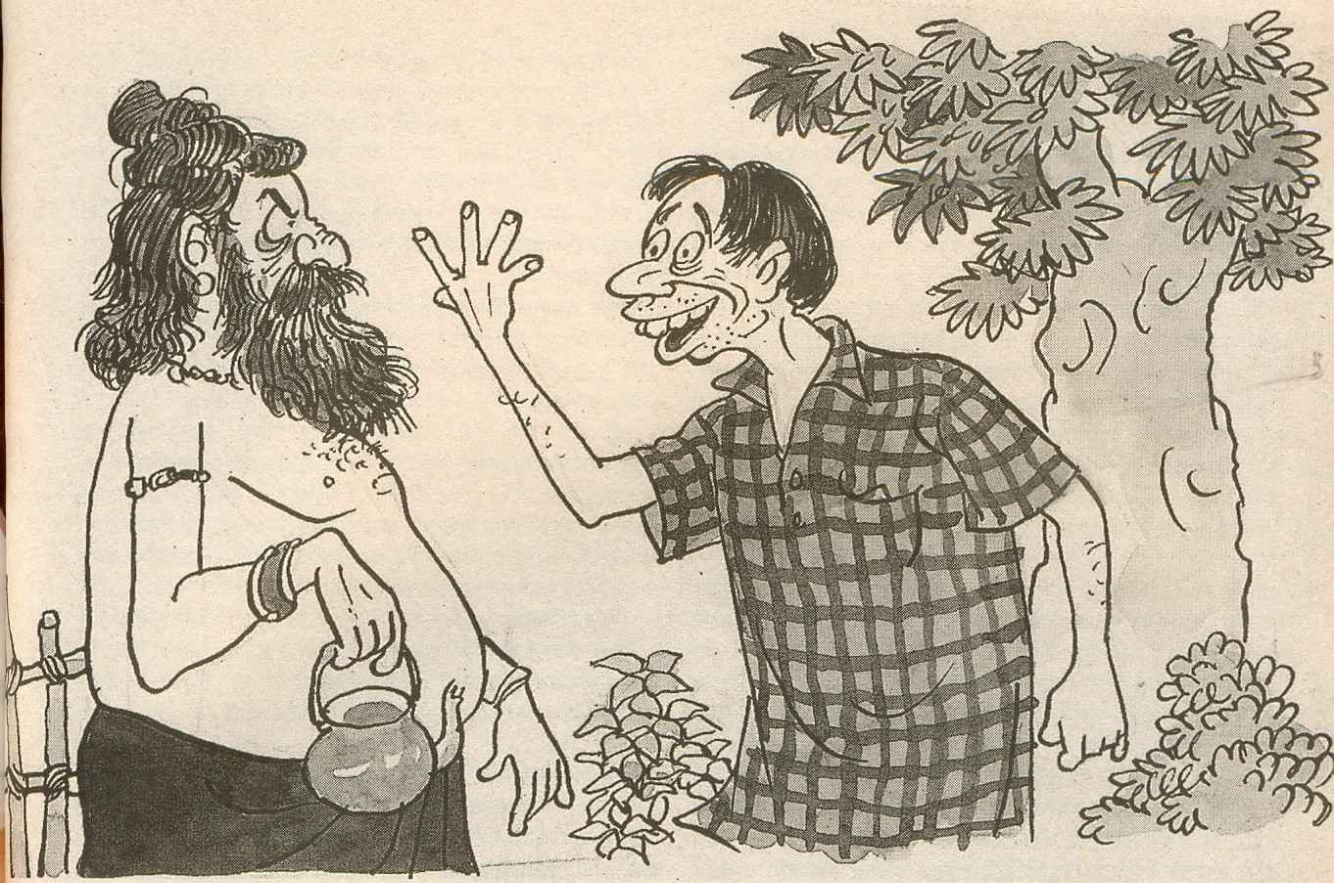
বলতে পারলি না, কে আমাকে বধ করবে? কার এত ক্ষমতা, কার এত বুকের পাটা? বল বদমাশ।"

আরও গোটাকয়েক চড় খেয়ে পান্টু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "আমি জানি না। এমনিই বলেছি।"

"তোর কাছে নিশ্চয়ই কোনও খবর আছে! বল, কে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে! বল, নইলে এক্ষুনি গুলি করে মারব।"

গাব্বু তার পিস্তল তুলতেই একটা শোরগোল উঠল। সবাই বলতে লাগল, "ওকে মারবেন না! ওকে মারবেন না! এবারের মতো মাপ করে দিন!"

গাব্বু পিস্তল নামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "আমার আড়ালে যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে তা হলে কিন্তু আমি ঠিকই খবর পাব। হুঁশিয়ার করে দিয়ে যাচ্ছি, কারও বদমতলব থাকলে সে কিন্তু রেহাই পাবে না। পায়েসপুরকে শ্মশান বানিয়ে ছাড়ব। মনে থাকে যেন।"

পায়েসপুরকে শাসন করে ঘোড়ায় চেপে টগবগ করে নিজের ডেরায় ফিরে এল বটে, কিন্তু গাব্বুর মনের মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ করছে। সত্যিই কি তাকে কেউ বধ করার ষড়যন্ত্র করছে নাকি?

আজও রাত্রিবেলা তার বড় হলঘরে হুরি-পরিরা নাচ-গান করে তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করছিল। কিন্তু মনটা ভাল নেই বলে সে হাতের ইশারায় তাদের বিদায় করে দিল। হুরি-পরি, গায়ক-বাদকরা চোখের পলকে মিলিয়ে গেল। দেশ-বিদেশ থেকে ওস্তাদ রাঁধুনিদের আনিয়ে তার জন্য বিশাল ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু দুশ্চিন্তায় কিছুই মুখে রুচল না গাব্বুর। তার হাতের ইশারায় ভোজের টেবিল, রাঁধুনি, সবই অদৃশ্য হয়ে গেল। সে দৈত্যকে ডেকে বলল, "কারা আমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে খবর আন তো!"

দৈত্য এক লহমায় ঘুরে এসে বলল, "সবাই ষড়যন্ত্র করছে জাঁহাপনা।"

"সবাই?"

"হ্যাঁ মালিক।"

"সর্বনাশ!"

॥ ৭ ॥

সাধুবাবার ভীমরতি যে দিনদিন বাড়ছে বই কমছে না, সে বিষয়ে গদাইয়ের কোনও সন্দেহ নেই। এখন তিন-তিনটে দানো শিবমন্দিরের চাতালে বাঁধাছাদা হয়ে পড়ে আছে। কারও চেতনা নেই। আরক খাইয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। সাধুবাবা তাদের দিকে আড়ে-আড়ে চায়, আর মাথা চুলকোয়। বোঝা যায়, বাবাজি কিছু ধন্দে পড়েছে।

গদাই একদিন সকালবেলায় জিজ্ঞেস করল, "তা হ্যাঁ বাবা, এত দিনেও কী সাব্যস্ত করা গেল না? কোন দানোটা আসল, আর কোনটা নকল? ত্রিকালদর্শী মানুষ আপনি, মন্তরের এত জোর, ধ্যানে বসলে শরীর হাল্‌কা হয়ে তিন হাত শূন্যে উঠে বসে থাকেন—নিজের চোখেই দেখেছি। তা আপনার মতো সাধকেরও যদি ভীমরতি হয়, তা হলে আমাদের মতো পাপী-তাপীর কোন দুর্গতি হবে কে জানে!"

সাধুবাবা একটু ভোমভোলা চোখে চেয়ে থেকে বলল, "তা গন্ডগোল একটু হচ্ছে বাপু। দেহ ছাড়ার সময় হলে বিভূতিগুলো একটু-একটু করে দেহ ছেড়ে পালাতে থাকে কিনা!"

গদাই একটু আশার আলো দেখে ভারী গদগদ গলায় বলল, "দেহ ছাড়ার সময় কি এসে গেল নাকি বাবা? তা হলে আপনার জিনিসগুলোর একটা বিলিব্যবস্থা এইবারে করে ফেললে হয় না?"

সাধুবাবা রোষকষায়িত লোচনে তাকে ভেদ করে বলল, "দুর ব্যাটা পাষণ্ড, আমার দেহ ছাড়তে-ছাড়তে আরও সত্তর-পঁচাত্তর বছর। তাও ক'টা বছর পর্বতগুহায় ধ্যানাসনে কাটিয়ে দিতে হবে।"

ভারী হতাশ হয়ে গদাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আহা, শুনে ধড়ে প্রাণ এল। সত্তর-পঁচাত্তর বছর লম্বা সময়।"

"সে তোদের কাছে। আমার কাছে ও তো চোখের পলক ফেলার সমান।"

"কিন্তু বাবা, এই কেষ্টর জীবগুলোকে এইভাবে কষ্ট দেওয়া ঠিক হচ্ছে? এদের মধ্যে কোনটা পিদিমের দানো সেটা তো মন্ত্রবলে ধ্যানযোগেই আপনার জানবার কথা।"

"ওইখানেই তো হয়েছে মুশকিল। কী জানিস, মাথার যে প্রকোষ্ঠে মন্তরগুলো থাকে, ইদানীং দেখছি, সেটা একটু ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে। কিছু-কিছু মন্তর কোন ফাঁকে যেন বেরিয়ে গিয়েছে।"

গদাই চোখ বড়-বড় করে বলল, "তা হলে তো সর্বনাশ! মন্তর পালিয়ে গিয়ে থাকলে উপায় কী হবে বাবা?"

"আরে পালিয়ে যাবে কোথায়! বেশি দূর যায়নি, আশপাশেই ঘোরাফেরা করছে। ওসব আমার পোষা মন্তর, গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে ফের ঠিক ফিরে আসবে।"

"আমি খবর নিয়ে দেখেছি বাবা, যাদের বেঁধে রেখেছেন তাদের একজন পায়েসপুরের পালোয়ান বটেশ্বর, আর-একজন রিটায়ার দারোগা রাধাগোবিন্দ। তাদের বাড়িতে-বাড়িতে বড্ড কান্নাকাটি হচ্ছে বাবা। আর তিন নম্বর দানুও বলেছিল বটে যে, সে মোটেই দানোটানো নয়। তার মৃগীর ব্যারাম ছিল। রমেশ কোবরেজ এক প্রাচীন পুঁথি থেকে নিদান বের করে পাঁচন গুলে খাওয়ায়। তাতে সে ঢ্যাঙা হয়ে পড়েছে, আর গায়ে খুব জোরও হয়েছে।"

সাধু গম্ভীর হয়ে বলল, "তোর কথায় বিশ্বাস কী? তুই ফন্দিবাজ মানুষ।"

"না বাবা, আপনার ভীমরতিটা দেখছি বেশ গেড়ে বসেছে। ভুল লোককে পাকড়াও করছেন, মন্তর ভুলে যাচ্ছেন, তৃতীয় নয়নে চালসে ধরেছে, এ যে বড় বিপদের কথা প্রভু! এরকম গুরু ধরে আমারই বা কী গতি হবে কে জানে বাবা?"

সাধু হুঙ্কার দিয়ে বলল, "তুই অতি বজ্জাত!" কিন্তু হুঙ্কারটা বড্ড মিয়নো শোনাল। অর্থাৎ ভুলভাল যে হচ্ছে, সেটা সাধু নিজেও টের পাচ্ছে।

গদাই সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আপনি তো কিছু এলেবেলে সাধু নন বাবা। ক্ষমতা বড় কম নেই আপনার। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে যখন ভুলচুক হচ্ছে তখন উপযুক্ত শিষ্যকে সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেই তো হয়। তারপর আপনি নিশ্চিন্তে হিমালয়ে গিয়ে লম্বা তপস্যায় বসে যান। ইদিকে আমি আপনার সব কাজকর্ম সামলে দিয়ে, লোককে নানারকম বুজরুকি দেখিয়ে একটু নামডাক করে ফেলি। তারপর আরও একটু বয়স হলে না হয় সাধন-ভজনে মন দেওয়া যাবে।"

সাধু গম্ভীর গলায় বলল, "তুই খুব ঘড়েল লোক।"

আজ সকালবেলায় পায়েসপুরে ঢুকেই গদাই ভারী অবাক হয়ে গেল। আগের দিন পায়েসপুরের আকাশে-বাতাসে, পাখির ডাকে দুঃখের ফুলঝুরি দেখে গিয়েছিল। আজ দুঃখের চেয়েও বেশি কিছু যেন চেপে বসে আছে পায়েসপুরের বুকে। সেটা শোক। পায়েসপুর একেবারে স্তব্ধ। গাছ নড়ছে না, কাক ডাকছে না, মানুষজন মাথা নত করে বসে আছে।

নগেনবাবু ধরা গলায় বললেন, "ওরে গদাই, পায়েসপুরের আর আশা নেই রে।"

হারাধনবাবু আবেগমথিত গলায় শুধু বলতে লাগলেন, "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ...," ইত্যাদি।

ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল গদাইয়ের। তবে শেষ অবধি টুকরোটাকরা কথা, দীর্ঘশ্বাস, কোটেশন এই সব জুড়ে বোঝা গেল যে, গাব্বু নামে একটা গুন্ডা প্রদীপের দৈত্যকে নিয়ে চারদিকে দাপিয়ে বেড়াতে লেগেছে। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বুকে ডুগডুগি বাজতে লাগল, উত্তেজনায় হাতে-পায়ে কাঁপুনি ধরে গেল।

গদাই দশগাঁ ঘোরা লোক। গাব্বুর খবর করতে তার খুব বেশি দেরি হল না। রাঘবগঞ্জের খাল পেরিয়ে হিরাপুরের জঙ্গল। তার মাইলটাক উত্তরে বিদড়িহাটের সীমানায় একটা ফলসা জঙ্গলের মধ্যে গাব্বুর কুঁড়েঘর। বেলাবেলি রওনা হলে বড়জোর ঘণ্টাটাক লাগবে।

গদাই পা চালিয়ে রওনা হয়ে পড়ল।

ঘণ্টাটাক পর সে বিদড়িহাটের ফলসাবনে ঢুকে হাঁ হয়ে গেল। কোথায় কুঁড়েঘর! এ তো বেশ একখানা জাঁকের বাড়ি! সামনে বাগান, বাগানে ফোয়ারা। ফুলটুলও ফুটে আছে মেলা। ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে সে খুব ভাল করে পরখ করল চারদিকটা। কেউ কোথাও নেই।

গদাই সাহস করে ঢুকে পড়ল ফটক ঠেলে।

সন্তর্পণে বারান্দায় উঠে কড়া নাড়তে যাবে বলে হাতটা বাড়িয়েছিল গদাই, ফস করে হঠাৎ সামনে ভুঁই ফুঁড়ে একটা সাত-আট হাত লম্বা আর অতিকায় চেহারার একটা লোক তার পথ জুড়ে দাঁড়াল। মেঘগর্জনের মতো গলায় বলল, "কী চাই?"

গদাই এমন ভড়কে গিয়েছিল যে, ধাত ছাড়ার উপক্রম। বুকের ধুকপুকুনি রেলগাড়িকে হার মানিয়ে এমন বেগে হতে লাগল যে, দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

একটু সামলে নিয়ে সে একগাল হেসে বলল, "প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম। তা শরীরগতিক সব ভাল তো?"

দৈত্যটা ভাবলেশহীন চোখে তার দিকে চেয়ে রইল শুধু। একটাও কথা বলল না।

হেঃ হেঃ করে হাত কচলাতে-কচলাতে গদাই গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "যা শুনেছিলাম, আপনি দেখছি তার চেয়েও সরেস! আহা, কী শালগাছের মতো হাত! কী থামের মতো পা! ফুটবল মাঠের মতো কী বিরাট ছাতি! আর লম্বাটাও বলতে নেই, তালগাছকেও লজ্জা দেয়। আপনার কাছে কোথায় লাগে বটেশ্বর, কোথায় লাগে রাধাগোবিন্দ, আর ঢ্যাঙাদানু তো আপনার কোমরের কাছে পড়বে!"

দৈত্যের বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, নিশ্চুপ।

"তা লোকে বলাবলি করছে বটে, হ্যাঁ, এত দিনে একটা মানুষের মতো মানুষ এসেছে বটে এ তল্লাটে! যেমন বুকের পাটা, তেমনই খ্যামতা। চারদিকে যে একেবারে ধন্যি-ধন্যি পড়ে গিয়েছে মশাই!"

"কী চাই?"

"না, বিশেষ কিছু চাইতে আসা নয়। গাব্বুদাদার সঙ্গে পুরনো চেনা তো! তা শুনলুম, গাব্বুভায়া এখন অনেক উন্নতি করে ফেলেছে। তাই একটু দেখে গেলুম আর কী। তবে কিনা মশাই, কেউ উন্নতি করলেই পাঁচজনের বড্ড চোখ টাটায়। আড়ালে আবডালে কেউ-কেউ পিছনে লাগবারও চেষ্টা করে কিনা! তা গাব্বুভায়া কি ঘুম থেকে উঠেছে মশাই?"

"আমার মনিব বিশ্রাম নিচ্ছেন। কারও দেখা করার হুকুম নেই।"

গদাইয়ের মুখ শুকনো। দৈত্যের চোখ এড়িয়ে ভিতরে যাওয়ার উপায় নেই। একেবারে তীরে এসে তরী বুঝি ডোবে! গদাই ঘাড় কাত করে বলল, "তা বিশ্রাম নেওয়াই উচিত। মেহনত বড় কম যায় না। আজও হয়তো রাতবিরেতে বেরোতে হবে।"

দৈত্য নিশ্চুপ।

"আচ্ছা মশাই, আপনার কি সাধুবাবুকে মনে আছে? সেই যে, আপনি যখন ছোট্টটি ছিলেন, তখন সাধুবাবা আপনাকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতেন, ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াতেন, ছোট বাইরে বড় বাইরে পরিষ্কার করতেন! সেই যে লম্বা-চওড়া চেহারার মস্ত সাধু!"

"আমি কোনও সাধুকে চিনি না। আমি কখনও ছোট্ট ছিলাম না। আমি চিরকাল একই রকম।"

"বাঃ। তা হলে বোধ হয় ভুলই শুনেছি। তবে এটা জানি যে, সাধুবাবা আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছেন। কারণটা ঠিক জানা নেই বটে। তবে মনে হল, আপনাকে ছাড়া তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। শত হলেও মায়ার বাঁধন তো!"

"তুমি মিথ্যেবাদী।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় কাত করে সায় দিয়ে গদাই বলল, "তা মিছে কথাও মাঝে-মাঝে বলে ফেলি বটে, তবে লোকের ভালর জন্যই বলা। সেই সঙ্গে গাব্বুভায়ার সঙ্গে একটু কাজের কথাও ছিল।"

"কী কথা?"

"সে বড় গুহ্য কথা।"

"আমাকে বলো। আমি তাঁর হুকুমদাস।"

"ওরে বাবা, সে উপায় নেই মশাই। গুরুতর খবর, গাব্বুভায়া ছাড়া আর কারও কাছে বলা যাবে না।"

"তুমি দাঁড়াও।" বলেই দৈত্য অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই আবার ফস করে সামনে ফলিত হয়ে বলল, "ভিতরে এসো।"

ভিতরে দিব্যি সব ব্যবস্থা। ভাল-ভাল চেয়ার, টেবিল, আরামকেদারা, দেওয়ালগিরি, দামি গালিচা। টেবিলে থরে-থরে আপেল, আঙুর, বেদানা

মজুত। শরবত-টরবতও আছে, দেখা গেল।

একটা সিংহাসনের মতো চেয়ারে পোশাক পরা গাব্বু ঘাড় হেলিয়ে বসা। চুল এলোমেলো, চোখ দু'টো যেন লাল, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ এবং ক্লান্তি। গদাইয়ের দিকে ক্রূর চোখে চেয়ে বলল, "তুমি কে?"

গদাই ভারী বিনয়ের সঙ্গে বলল, "ভুলে গেলে নাকি ভাই? আমি হলুমগে গদাই।"

কাহিল চোখে চেয়ে থেকে বেশ ক্লান্ত গলায় গাব্বু বলল, "তুমি জড়িবুটিওলা গদাই না?"

গদাই একগাল হেসে বলল, "এই তো ভাইটির মনে পড়ে গিয়েছে। আমার তো ভয় ছিল, বড়মানুষ হয়ে আমাকে বোধ হয় চিনতেই পারবে না! তা ভায়া, তোমার উন্নতি দেখে ভারী খুশি হলুম। কিন্তু তোমার চেহারাটা তেমন ভাল দেখছি না! শরীরটা কি খারাপ যাচ্ছে? খুব হয়রান হয়ে পড়োনি তো!"

গাব্বু অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, "আঃ! বাজে কথা ছাড়ো। এখন বলো তো, কী মতলবে এসেছ?"

গদাই একটু থমমত খেয়ে ফের বিগলিত হয়ে বলল, "মতলবেই আসা বটে, তবে মতলব কিছু খারাপ নয় রে ভাই। বলতে এলুম যে, জীবনে উন্নতি করলেই তো হল না, সেইসঙ্গে পথের কাঁটাও তো নিকেশ করা চাই, নাকি?"

গাব্বু সোজা হয়ে বসে বলল, "কে আমার পথের কাঁটা?"

"দ্যাখো ভাই, তোমার ভাল ভেবেই কষ্ট করে হাঁফাতে-হাঁফাতে এত দূর এসেছি। তাও তো তোমার পাহারাদার আমাকে গলাধাক্কাই দিচ্ছিল আর কি!"

"কিছু মনে কোরো না ভাই। চারদিকে আমার বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে খবর পেয়েছি, তাই সাবধান হতে হয়েছে। এবার বলো।"

"বলি, গলা ভিজনোর জন্য একটু জল পাওয়া যাবে কি?"

"আহা, জল কেন, ভাল শরবত আছে, খাও। ওরে গোলাম, শরবত দে।"

দৈত্যটা চট করে এক গেলাস শরবত এনে দিল। মুখে দিয়েই গদাই বুঝল এ বড় উঁচু জাতের জিনিস, জন্মেও এরকম কখনও খায়নি। তবে তার জল বা শরবতের দরকার ছিল না। কী বলবে সেটা এঁচে নিতে একটু সময়ের দরকার ছিল মাত্র। শরবত খেতে-খেতেই সে বয়ানটা গুছিয়ে ফেলল।

তারপর গেলাস রেখে জামায় মুখ মুছে গলাটা খাটো করে বলল, "খবরটা ঠিকই পেয়েছ ভায়া। তোমাকে নিকেষ করে পিদিমটা কেড়ে নেওয়ার একখানা পাকা ছক কষা হয়ে গিয়েছে।"

"কে? কার এত সাহস?"

"প্রতাপগড়ের জঙ্গলে একটা ভাঙা শিবমন্দির আছে জানো তো?"

"জানি।"

"সেখানে ক'দিন হল এক সাধু আস্তানা গেড়েছে। পেল্লায় চেহারা। সাক্ষাৎ নরখাদক। সে পিদিমটার সন্ধানেই এসেছে। তার মেলা চেলা-চামুণ্ডা। ভূত-প্রেতও তার বশ। যদি সাবধান না হও, তা হলে পিদিম রক্ষে করতে পারবে না।"

গাব্বু একটা অট্টহাসি হেসে পাশের একটা সোনার পাত্র থেকে একমুঠো মোহর তুলে তার হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও বখশিস। সাধুর জারিজুরি কী করে ভেঙে দিই তাও দ্যাখো। ওরে গোলাম, যা, গিয়ে প্রতাপগড়ের জঙ্গলের ভাঙা শিবমন্দির থেকে সাধুটাকে ধরে নিয়ে আয়।"

দৈত্য হুশ করে অদৃশ্য হল। এবং এক লহমায় ফিরে এল! ঘাড় ধরে সাধুকে নিয়ে এসেছে। সাধু ত্রিশূলটা অবধি রেখে আসার ফুরসত পায়নি। সেটা এখনও এক হাতে ধরা। সাধুকে গাব্বুর সামনে নামিয়ে দিয়ে সে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াল।

গাব্বু সাধুর দিকে রক্তচোখে চেয়ে বলল, "কী হে সাধুবাবাজি, তোমার মতলবখানা কী?"

সাধুবাবা মিটমিট করে একবার গাব্বু আর একবার গদাইয়ের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর বজ্রগম্ভীর গলায় বলল, "আমার পিদিম দে।"

হোঃ হোঃ করে হেসে গাব্বু তার আলপাকার পোশাকের পকেট থেকে পিদিমখানা বের করে হাতের তেলোয় রেখে বলল, "এইটে চাই বুঝি তোমার?"

সাধু গমগমে গলায় বলল, "যার জিনিস তাকে ফেরত দে পাপী। নইলে কপালে কষ্ট আছে।"

"বটে! ওরে গোলাম, সাধুটাকে তুলে কয়েকটা আছাড় দে তো!"

দৈত্য চকিতে এগিয়ে এসে সাধুকে তুলে বিশাল জোরে মেঝের উপর আছড়ে ফেলল। সেই আছাড়ের শব্দে কেঁপে উঠল গোটা বাড়ি। গোটাপাঁচেক আছাড়ের পর গাব্বু বলল, "যাক, আর নয়। কী সাধু, পিদিম চাই?"

"চাই, দে। নইলে তোর সব যাবে। পিদিমের জোরে যদি রাজা হতে চাস, তবে লোকে তোর গায়ে থুথু দেবে। এই সব ভোজবাজির আয়ু বেশি দিন নয়। এখনও সময় আছে। পিদিম ফেরত দে।"

"এই দিচ্ছি। ওরে গোলাম, ওর ত্রিশূল দিয়েই ওকে ফুঁড়ে দে তো। এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে তবে ছাড়বি।"

গদাই সভয়ে চোখ বন্ধ করে চিৎকার করল, "না! না!"

দৈত্য বিনা দ্বিধায় শূলটা তুলে নিয়ে সাধুর বুকে ভীমবেগে বসিয়ে দিল। সাধুকে ভেদ করে পিঠ থেকে শূলের ডগা বেরিয়ে রইল।

সাধু ফের অবিচল কণ্ঠে বলল, "তোর মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার নয়। আমার মরার যখন সময় হবে তখনই আমি মরব। ইচ্ছামৃত্যু। তার আগে কারও হাতেই আমার মরণ নেই। পিদিমটা দে।"

গাব্বুর মুখ হাঁ, চোখ বিস্ফারিত। সে যে ভয় পেয়েছে তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। তোতলাতে-তোতলাতে সে বলল, "তু-তুমি মরলে না?"

সাধু একটানে শূলটা বের করে বলল, "দে।"

গাব্বু পিদিমটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে বিকট চিৎকার করে বলতে লাগল, "গোলাম, ওকে মেরে ফ্যাল, শিগ্‌গির মেরে ফ্যাল! যেমন করেই হোক মেরে ফ্যাল।"

কিন্তু হঠাৎ সাধু বিদ্যুৎ-বেগে শূলটা ছুড়ে দিল গাব্বুর দিকে। সেটা নিখুঁত নিশানায় তার ডান হাতের কব্জি ভেদ করে যেতেই পিদিমটা ঠং করে পড়ে গেল মেঝেয়। ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা অতি তৎপরতায় তুলে নিল গদাই। তারপর চোখ পাকিয়ে দৈত্যের দিকে চেয়ে বলল, "চুপচাপ ঘরের কোণে গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসে থাক।"

দৈত্য বলল, "জো হুজুর। তারপর গিয়ে ঘরের কোণে হাঁটু মুড়ে বসল।"

সাধু জ্বলজ্বলে চোখে গাব্বুর দিকে চেয়ে হাত তুলে বলল, "পুনর্বিগত ভবঃ।"

হঠাৎ ঘরদোর সব মিলিয়ে গেল। দেখা গেল একটা দীন-দরিদ্র খোড়োঘরে তারা রয়েছে। গদাই চোখ কচলে বলল, "বাবা, এসব কি হাওয়াবাজি ছিল নাকি?"

"দুনিয়ার সব কিছুই হাওয়াবাজি রে ব্যাটা। যত তাড়াতাড়ি তোর জ্ঞান হবে তত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবি।"

গাব্বু কব্জি চেপে ধরে কাতরাতে-কাতরাতে অবিশ্বাসের চোখে সাধুবাবার দিকে চেয়ে ছিল। হিংস্র গলায় বলল, "আমার পিদিম কেড়ে নিয়েছ! ওরে গোলাম, পিদিমটা উদ্ধার করে আমাকে দে।"

গোলাম নড়লও না।

সাধু বলল, "আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমি যাচ্ছি। শোক কোরো না। ও পিদিম তোমার নয়, আর ও জিনিস হজম করার ক্ষমতাও তোমার নেই। কয়েক দিনেই সারা এলাকার সর্বনাশ করতে বাকি রাখোনি। বাকি জীবন আধপেটা খেয়ে থাকবে, এই তোমার শাস্তি।"

তারপর সাধু গদাইয়ের দিকে ফিরে বলল, "এই খাড়া দুপুরে এতটা পথ হেঁটে ফিরতে পারব না রে বাপু। দত্যিটাকে বল, একটু পৌঁছে দিক।"

জিভ কেটে গদাই তাড়াতাড়ি পিদিমখানা সাধুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে

বলল, "আপনি বলুন বাবা, জীবনে কখনও দাসদাসী খাটাইনি তো। ও আমার সইবে না।"

সাধু একটু হাসল।

দৈত্যের পিঠে চেপে এক লহমায় প্রতাপগড়ের জঙ্গলে শিবমন্দিরের চাতালে পৌঁছে গেল তারা।

সাধুবাবা দৈত্যকে বলল, "তোর কাজ শেষ হয়েছে বাবা, এবার পিদিমের ভিতরে গিয়ে ঘুমিয়ে থাক।"

"যথা আজ্ঞা মহারাজ।" বলেই দৈত্যটা একেবারে ধোঁয়াক্কার হয়ে গিয়ে পাক খেয়ে-খেয়ে সুতোর মতো সরু হয়ে সুড়সুড় করে পিদিমের মধ্যে ঢুকে মিলিয়ে গেল।

পিদিমখানা ঝোলায় পুরে সাধুবাবা বলল, "ওই তিনটে লোকের বাঁধন খুলে দে বাপু। এই ওষুধটা খাইয়ে দে। আমি রওনা দেব রে!"

"সে কী বাবা! এখনই যাবেন কি? আমার যে সাধন-ভজন শেখা এখনও অনেক বাকি।"

সাধুর দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে এবার একটু হাসি দেখা গেল। বলল, "সাধন-ভজন কী আর একরকম রে? নানাজনের নানারকম। লোভটোভ করিসনি বাবা, দুনিয়াটাকে একটু ভালবাসিস, আমাকে মনে রাখিস, আর শোন, অল্পে আনন্দ পেতে শিখে নিস। তোর ওতেই হবে রে। আর এই আমার ঝোলাখানা আজ থেকে তোর কাঁধে ঝুলবে।"

"উরেব্বাস রে! ওতে যে ওই সব সাঙ্ঘাতিক জিনিস আছে?"

"তা আছে। পরশপাথর, আশ্চর্য পিদিম, উড়ুক্কু গালিচা আর অক্ষয় থালা। দুনিয়ার সব ঐশ্বর্য তোর হাতের নাগালে রেখে গেলাম। আজ আর আমার কোনও ভার নেই।"

"আমি কিন্তু বেশ লোভী লোক বাবা!"

"তা আমি জানি। তুই লোভী, পেটুক, একটু ঘড়েল। তবু এই কলিযুগের পক্ষে তুই তেমন খারাপ লোক নোস। কত লোককেই তো কত জিনিস দিয়ে নিরখপরখ করলাম। তোকেও না হয় একটু বাজিয়ে দেখা যাক।" তারপর সাধু হাত তুলে বলল, "আনন্দম!"

সাধু চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ মনটা বড় খারাপ হয়ে রইল গদাইয়ের। তার পর সে ধীরে-সুস্থে বটেশ্বর, রাধাগোবিন্দ আর দানুর বাঁধন খুলল, তাদের ওষুধ খাওয়াল। জ্ঞান ফেরার পর তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে জঙ্গলের সীমানা পার করে দিয়ে এল।

তারপর শিবমন্দিরে ফিরে সাধুর ঝোলা খুলে জিনিসগুলো বের করে চাতালে পরপর সাজিয়ে রেখে চেয়ে রইল। পিদিমের দৈত্য তাকে লহমায় রাজা করে দিতে পারে। পরশপাথর পারে মন-মন সোনা তৈরি করতে। উড়ুক্কু গালিচায় চেপে আকাশে উড়ে যেখানে খুশি চলে যাওয়া যায়। আর অক্ষয় থালার কাছে চাইলে পাওয়া যায় দুনিয়ার সবরকম খাবারদাবার। বুকটা বড় দুরদুর করে উঠল তার। সাধুবাবার কি উচিত হল এত সম্পদ তাকে দিয়ে যাওয়া?

অনেকক্ষণ বসে-বসে ভাবল সে। ভাবতে-ভাবতে চোখে জল এল।

॥ ৮ ॥

দানু ফের সরযূদেবীর বাড়িতে বহাল হয়েছে এবং তার আদর বেড়ে পাঁচ গুণ হয়েছে। রাধাগোবিন্দবাবুর 'দারোগার দীর্ঘশ্বাস' তরতর করে এগিয়ে চলেছে। ক'দিন ফাঁক যাওয়ার পর বটেশ্বর দ্বিগুণ উৎসাহে ভারতশ্রী হওয়ার জন্য ব্যায়াম শুরু করেছে। হারাধনবাবু আবার পায়েসপুরের গৌরবের কথা লোককে স্মরণ করিয়ে দিতে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

দেখতে-দেখতে হবিবপুরের সঙ্গে পায়েসপুরের ফিরতি ম্যাচের দিন এসে গেল। এবার খেলা পায়েসপুরে, মাঠে লোক ভেঙে পড়েছে। মাঠভর্তি দর্শকদের মধ্যে বিশিষ্ট আসনে ভূপেনদারোগাও বসে আছেন।

যথারীতি দানু অষ্টাবক্র মুনির মতো বল ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে গিয়েছে এক ফাঁকে। ভূপেনবাবু "অফ সাইড, অফ সাইড," বলে চেঁচাচ্ছেন। এবং যথারীতি দানু গোল দিয়ে দিল। কেউ এঁটে উঠতে পারছে না তার সঙ্গে। আজ সে দুর্ধর্ষ খেলছে। সবাই বলাবলি করতে লাগল, সাধুর আরক খেয়ে দানুর খেলা আরও খুলেছে।

হবিবপুর শেষ অবধি আট গোলে হেরে মাথা নিচু করে ফিরে গেল। ভূপেনবাবু অবশ্য বাজে রেফারিং-এর দোষ দিতে ছাড়লেন না।

হলধর ঘোষের বাড়িতে সকালের জমায়েতটি রোজকার মতো আজও বসেছে। হলধর তাঁর নতুন আবিষ্কারের কথা সবিস্তার বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। তাঁর তিনটি আবিষ্কার শেষ হওয়ার মুখে। অটো-ঝি, অটো-ঝাঁটা এবং অটো-রুটি। শুনে কেউ হাসলেন না। কারণ, হাসাহাসি করলে চা, চিড়েঁভাজা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শুধু হারাধনবাবুই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "বের করে ফেলুন, বের করে ফেলুন! জগৎসভায় পায়েসপুরের নিশেন উড়িয়ে আসতেই হবে। আর নোবেলটা এনে ফেলতে পারলে ভূপেনদারোগার মুখে একেবারে ঝামা ঘষে দেওয়া যাবে। নোবেল-মন্দিরও বানিয়ে ফেলব একটা, যেখানে রেগুলার পুজোপাঠ হবে, দেশ-বিদেশের লোক ভেঙে পড়বে পায়েসপুরে।"

বড্ড ফাঁপড়ে পড়ে গিয়েছে গদাই। চিনির বলদ কাকে বলে তা খুব টের পাচ্ছে সে। কাঁকালের ব্যথায় সেদিন হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না বলে উড়ুক্কু গালিচায় চেপে পায়েসপুর ঘুরে আসবে বলে ঠিক করেছিল। সবে গালিচাখানা চাতালে পেতে উঠতে যাবে অমনই গালিচার ভিতর থেকে সাধুবাবার গমগমে গলা পাওয়া গেল, "উঁহু!" শীতের শুরুতে একদিন একটু পোলাও-কালিয়া খাওয়ার জন্য প্রাণটা আনচান করায় অক্ষয় থালাটা চুপিচুপি বের করে বাসনা ব্যক্ত করতে যেতেই থালা কেঁপে উঠল এক বজ্রকণ্ঠে, "উঁহু!" শীতের শুরুতে একখানা নরম ওমওয়ালা কম্বল কিনবে বলে একখানা বাটখারা কিনে এনে তাইতে পরশপাথরটা ঠেকাতে গিয়েছে, অমনই পাথরের ভিতর থেকে সাধুবাবার বিটকেল গলায় ফের সেই, "উঁহু!" কিছু কাঠ কেটে জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু সেদিন বড় কব্জির ব্যথা। তাই ভাবল, দত্যিটাকে দিয়ে করিয়ে নিলেই তো হয়! পিদিমটা দোনোমোনো করে সবে ঝোলা থেকে বের করেছে, পিদিমের ভিতর থেকে সেই থমথমে গলা ধমকে উঠল, "উঁহু!" এখন উঁহুর ঠেলায় গদাই একেবারে অস্থির।

তবে সে কিছু খারাপও নেই। জড়িবুটি ফিরি করে, সাপের বিষ বের করে, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। না, ভেবে দেখলে, সে বেশ আনন্দেই আছে।